

ঢাবু ও কবিবুলা

সপ্তম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ
থেকে সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

চারু ও কারুকলা সপ্তম শ্রেণি

রচনা

হাশেম খান

এডলিন মন্সাবর

এ.এস.এম আতিকুল ইসলাম

সঞ্জীব দাস

সম্পাদনা

মুস্তাফা মনোয়ার

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পত্রীকামূলক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সমন্বয়ক

সুজাউল আবেদীন

সুদর্শন বাহার

প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কন

হাশেম খান

এডভিল মল্লিক

সন্জীব দাস

এ. এস. এম. আতিয়ুল ইসলাম

সুদর্শন বাহার

সুজাউল আবেদীন

কম্পিউটার কন্সাল্ট

কলার গ্রাফিক

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সদ্রকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণ : :

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বোত্তমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অর্জনবাহিত মেধা ও সজ্জবলার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া প্রাথমিক স্তরে অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন খটোলে হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিবনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্মদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমূলক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বত্বস্বত্ব প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের সূচকস্বরূপ ২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিবনফল যুক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জনিতব্য জ্ঞানের ইচ্ছা প্রদান করা হয়েছে এবং বিভিন্ন কাজ, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে মূল্যায়নকে সৃজনশীল করা হয়েছে।

সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে মূল্যায়নকে সৃজনশীল করা হয়েছে। প্রকৃতিকে ছিন্ন ও সুশৃঙ্খলভাবে পর্যবেক্ষণ করে তাকে মানসিক, সৈহিক ও নান্দনিক দৃষ্টিতে তুলে ধরতে চান্দু ও কবুকলা বিষয়টি শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট সহায়তা করবে। শিক্ষার্থীদের শিল্পবোধ ও জীবনের প্রতি মমত্ববোধ তৈরির ক্ষেত্রে চান্দু ও কবুকলা বিষয়টি অতি জরুরি। এই বিষয়টি পাঠদানের জন্য তাই ব্যবহারিক ও হাতে কলমে কাজের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আশা করি ৭ম শ্রেণির চান্দু ও কবুকলা পাঠ্যপুস্তকে নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের উন্মোচনোত্তর দৃষ্টান্তে প্রতিফলিত হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্কীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। কাজেই পাঠ্যপুস্তকটির আরও সমৃদ্ধিসাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের বিপুল কর্মস্বল্পের মধ্যে অতি দৃষ্টি সময়ের মধ্যে পুস্তকটি রচিত হয়েছে। ফলে কিছু ত্রুটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণগুলোতে পাঠ্যপুস্তকটিকে আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত, থাকবে। বালানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বালাননীতি।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালজ্জিদন

চেয়ারম্যান

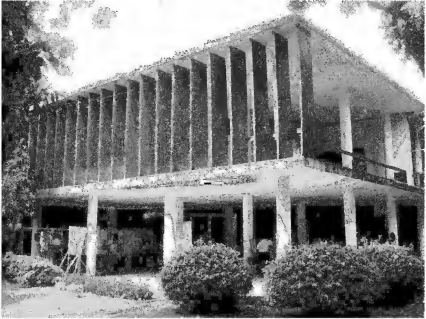
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

অধ্যায়ের নাম	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	বাংলাদেশে চল্লিকলা শিল্পার ইতিহাস	১-৭
দ্বিতীয়	চিল্লিকলা সর্বকালে সব মানুষের ভাষা	৮-১৬
তৃতীয়	বাংলাদেশের লোকশিল্প ও কল্লিশিল্প	১৭-২৭
চতুর্থ	ছবি আঁকার বিভিন্ন মাধ্যম	২৮-৩১
পঞ্চম	ছবি আঁকার নানারকম আনন্দদায়ক অনুশীলন	৩২-৪০
ষষ্ঠ	বিভিন্ন প্রকার শিল্পকর্ম	৪১-৬০
	রঙ ও রঙের ব্যবহার	৬১-৬৮

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশে চারুকলা শিক্ষার ইতিহাস



চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- বাংলাদেশে চারণ ও কারুকলা শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করতে পারব।
- বাংলাদেশে চারুকলা শিক্ষার পথিকৃৎ শিল্পীদের নাম উল্লেখ করতে পারব।
- সমাজে শিল্প শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ: ১

যারা ছবি আঁকেন তাবা চিত্রশিল্পী, গানের শিল্পীদের বলা হয় সংগীতশিল্পী, অভিনেতা অভিনেত্রীরা পরিচিত হন নাট্যশিল্পী বা চলচ্চিত্রশিল্পী হিসেবে। যারা নৃত্য পরিবেশন করেন তাবা নৃত্যশিল্পী হিসেবে পরিচিত। একাধিক সংস্কৃতি চর্চার প্রত্যেকটি বিভাগ ও বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন বা নির্দিষ্ট পরিচয় রয়েছে।



ছবি আঁকছেন জুবনুল আবেদিন

শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই চর্চা বা অনুশীলন প্রয়োজন।

ছোটবেলা, বড়বেলা, যেকোনো বয়স থেকেই যেকোনো শিল্পকলার চর্চা করা যায়। অবার প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ে চর্চা করার জন্যে, নির্দিষ্ট কিছু সহজ নিয়ম-কানুন মেনে অনুশীলন করতে হয়।

যেমন গান গাওয়ায় জন্য সুব, তাল, লয় ইত্যাদি জালো করে বুঝে নিতে হয়। সাবগামা বা সপ্তসুর থেকে শুরু করে অন্যান্য সুব, তাল ইত্যাদি রঙ করার জন্য প্রতিদিন অভ্যাস করতে হয়। যাকে সংগীত শিল্পীরা বলেন রেণুবাছ করা বা গলা সাধা। একজন সংগীত শিল্পীকে সারাজীবনই রেণুবাছ করতে হয়। সংগীতের ক্ষেত্রে যাঁরা খ্যাতিমান তাঁরা জীবনজর এই নিয়ম মেনে রেণুবাছ করার বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

চিত্রকলার ক্ষেত্রেও নিয়মিত ছবি আঁকতে হয়। চর্চা বা অনুশীলন করতে হয়। তবে সংগীতের ক্ষেত্রে যেমন শিশু বয়স থেকে সাবগামা ও সুব তাল লয় দীক্ষা নিতে হয় – আঁকার ক্ষেত্রে শিশুদের ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম-কানুন জেনে ছবি আঁকার চেয়ে শিশু ইচ্ছেমতো আঁকুক, নিজেব চিন্তা, স্বপ্ন ও ইচ্ছাকে বং তুলিতে তাব কাগজে সহজে একে ফেঁসুক – এই স্বাভাবিকতাকেই গুরুত্ব দেয়া হয়। শিশুকে কখনো নির্দেশ দিয়ে ছবি আঁকানো উচিত নয়। শিশু ও ছোটরা একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত নিজে নিজেই আঁকবে। শিশু নিজে আঁকতে পলছে বলে অপার আলদে খুবই সুন্দর ছবি আঁকে।

সামান্যলত যঠ শ্রেণি থেকেই ধীরে ধীরে আঁকার নিয়ম-কানুন জেনে ছবি আঁকার চেষ্টা করা ভালো, মোটামুটি পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিশু নিজে নিজে আঁকবে। নিয়ম-কানুন মেনে শিক্ষাগ্রহণ করাকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বলে। বাংলাদেশে চার ও কার্যকলা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কথা এবার আমরা জানব।

পাঠ: ২

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আগেই ঢাকার ১৯৪৮ সালে চিত্রকলা শেখার প্রতিষ্ঠান গড়ে তেলা হয়। উদ্যোগ গ্রহণ করেন কয়েকজন চিত্রশিল্পী। যাঁরা কোলকাতা আর্ট কলেজে শিল্পশিক্ষা সমাপন করেন। এঁরা হলেন শিল্পাচার্জ জুবনুল আবেদিন, পুঁথি কামরুল হাসান, বাচ্চা শফিক আহমেদ, শফিউদ্দিন আহমেদ, আমেনাঝল হক ও শফিকুল আমিন। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে দুইশত বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলে ভারত দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে ভাগ হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। একটির নাম ভারত ও অন্য অংশের নাম পাকিস্তান। পাকিস্তানের আবার দুটি অংশ – পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান।



শিক্কাচার্য জয়রাজ আবেদিন

১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকাতে চারুকলা ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠায় শিল্পীদের অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সামাজিকভাবে সেই কালে ‘ছবি আঁকা’ বিষয়ের গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। কেউ ছবি একে জীবন-যাপন করবে এটা কেউ ভাবতেই পারত না। কারণ-ছবি একে কী হবে? ছবি একে উপার্জন করার তেমন ব্যবস্থা দেশে ছিল না। সরকারি কোনো চাকরি ছিল না। তাহলে ছবি একে কী হবে?



শিল্পী কামরুন্না হাসান

অন্যদিকে সামাজিক কুসংস্কার ও গোড়ামিও একটি বড় বাধা ছিল।

তাই শিল্পী জয়রাজ আবেদিন, কামরুল হাসান, আলোয়ারুল হক, সফিউদ্দিন আহমেদ যখন সরকারকে প্রস্তাব দিলেন – দেশ ভাণ্ডারিগির পর অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতো কোলকাতা আর্ট কলেজের অর্ধেক পূর্ব বাংলার মানুষ পায়। তাই সহজেই পূর্ব বাংলার মানুষের জন্যে রাজধানী ঢাকায় একটি আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা করা যায়। উল্লেখিত শিল্পীরা প্রায় সবাই ছিলেন কোলকাতা আর্ট কলেজের শিক্ষক ও পূর্বতন ব্রিটিশ শাসিত ভারত সরকারের কর্মচারি।



পঠ: ৩

তৎকালীন পাকিস্তান সরকার খুবই অবহেলায় শিল্পীদের প্রস্তাব বাতিল করে দিল।

কারণ দেখাল – পাকিস্তান এখন ইসলামিক দেশ। ইসলামী ভাবধারা সর্বত্র প্রতিষ্ঠা পায় এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই এখন পাকিস্তানের জন্য প্রয়োজন। আর্ট কলেজ করে সোঁতা হবে না।

শিল্পীরা পিছ পা হলেন না। সরকারকে বোঝালেন– নতুন দেশকে সুন্দরভাবে গড়তে হলে, মানুষের জীবন-যাপনকে সুন্দর ও রুচিশীল করার জন্যে সমাজে শিল্পীদের প্রয়োজন আছে। কয়েকটি উদাহরণ তাঁরা সে সময় উল্লেখ করেন। যেমন–

১. সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে হবে এবং তাদেরকে বিভিন্ন রোগ থেকে নিরাময় পেতে হলে – ছবি একে পোস্টার তৈরি করে খুব সহজেই বোঝানো যায়। যা বইপুস্তকে লেখালেখি করে বোঝানো সহজ নয়। কারণ দেশে লেখাপড়া জানা মানুষের সংখ্যা খুব কম।
২. সরকারের বিভিন্ন বিষয়ের প্রচার কাজে– রাস্তায় ইটিচলা, বাস-ট্রাক চলাচলের নিয়ম-কানুন ইত্যাদির জন্য পোস্টার ও প্রচারপত্রের জন্য শিল্পীর প্রয়োজন হবে।
৩. সহজে চাষ করা, সেচ দেয়া, পোকামাকড় থেকে সাবধান থাকা থেকে শুরু করে কীভাবে কৃষি ফলন বাড়ানো যায় তা ছবি একে সাধারণ কৃষককে বোঝানো যায়।
৪. মানচিত্র আঁকা, স্কুল-কলেজের পুস্তকের জন্য ছবি আঁকা, চিকিৎসাবিন্যা ও কারিগরিবিদ্যার বই পুস্তকের জন্য শিল্পীর প্রয়োজন জরুরি।
৫. সদ্য নতুন দেশে শিল্প কারখানা ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে। এসব কারখানার উৎপাদনের পর বাজারে ও বিদেশে রপ্তানি করতে গেলে নানারকম রঙ মোড়ক তৈরি করতে হবে। নকশা ও ছবি আঁকতে হবে। ছবি একে বিজ্ঞাপন করতে হবে।

সুতরাং দেশের কাজে, জনগণের প্রয়োজনে ও কল্যাণে সমাজে চিত্রশিল্পীদের প্রয়োজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিল্পী তৈরি করার জন্য একটি কলেজ বা প্রতিষ্ঠান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরকারিভাবেই গুরু করতে হবে।

পাঠ : ৪

চিত্রশিল্পীরা এমনি নানারকম হুজি দিয়ে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে তুলে ধরলেন যে চারুকলা শিক্ষা দেশের প্রয়োজনেই প্রতিষ্ঠা করা উচিত। শিল্পীদের এই উদ্যোগকে প্রশংসা করে এগিয়ে আসেন বাঙালি কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী মানুষ। বিজ্ঞানী ড. কুদরত-এ-খুদা তখন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের জার্নালিস্টা বিভাগের প্রধান (ডি পি আই)। তিনিও সরকারকে বোঝালেন চারুকলা শিক্ষা অবশ্যই প্রয়োজন। সরকারি উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সগিয়ারহা ফাহিম, আবুল কাশেম প্রমুখ শিল্পীদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। এঁরা মান্যভাবে সরকারের চারুকলা শিক্ষার প্রতি অসীহা ও বিবৃণ মনোভাবকে সরিয়ে বিষয়টির প্রয়োজনকে উপলব্ধি করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। সেই সময়ে লেখক, সাংবাদিক ও সংস্কৃতিত মানুঘরাও ছবি আঁকা শিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ে ববরের কাগজে লেখালেখি শুরু করলেন। এরা হলেন – ড. সালোয়ার মোরশেদ, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, মুন্সীর চৌধুরী, শওকত ওসমান, অজিত গুহ, সিকান্দার আবু জাফর, গিয়াহুদুল হক প্রমুখ। বোম্বায়েশি ও আলোচনার ফলে সরকারও ধীরে ধীরে নমনীয় হলেন। যদিও কিছু মানুষ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সরকার ও সংস্কৃতিপ্রেমীদের প্রতি বিবৃণ মন্তব্য শুরু করল। তারা রীতিমতো ফতোয়া দিল- ইসলামী দেশে ছবি আঁকা নাছারা বা পাপের কাজ। কিন্তু চারুকলা প্রতিষ্ঠান শুরু হবার ৪/৫ বছরের মধ্যেই চিত্রশিল্পীরা প্রমাণ করে চলল, ধর্মের দোহাই একটি বাজে অভ্যুহাত। এটি কিছু ব্যক্তির মনগড়া কথা। চিত্রকলা শিক্ষা ও চর্চা মানুষের কল্যাণে এবং দেশের বিভিন্ন কাজে, উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পাঠ : ৫

অনেক চেষ্টার পর অবশেষে ছবি আঁকা শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যাপীঠ, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী এই ঢাকা শহরে প্রতিষ্ঠিত হলো। তারিখ ছিল ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সা। নবাবপুরে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের দুটি কামরায় শুরু হলো প্রথম ছবি আঁকার প্রতিষ্ঠান। নাম দেয়া হলো গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট। ১২ জন ছাত্র ভর্তি হয়েছিল ১ম বছর। অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ পান শিল্পী জয়নুল আবেদিন। অন্যান্য শিক্ষকরা হলেন আলোয়ারুল হক, রাজা শফিক আহমেদ, কামরুল হাসান, সৈয়দ আলী আহসান ও শফিকুল আমিন। এঁরা প্রত্যেকেই কলকাতা আর্ট কলেজে পড়েছেন। জয়নুল আবেদিন, আলোয়ারুল হক ও শফিকউদ্দিন আহমেদ কলকাতা আর্ট কলেজে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন। ১৯৪৭-এ দেশ ভাা হয়ে গেলে তারা ঢাকায় চলে আসেন। তারপর প্রায় এক বছর সংগ্রাম করে ঢাকায় কলকাতার অনুরূপ একটি চিত্রকলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন। দুই বছর পর শিক্ষক হিসেবে বোণ দিলেন শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়া। তিনিও কলকাতা আর্ট কলেজে লেখাপড়া করেছেন।

পাঠ : ৬

চারু ও কারুকলার পথিকৃৎ শিল্পীরা

১৯৪৮ সালে শুরু হয় বাংলাদেশে তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পশিক্ষার সূচনা। যারা এ আন্দোলন অর্থাৎ শিল্পশিক্ষার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদেরকেই আমরা বলব পথিকৃৎ শিল্পী। কারণ তাঁরা পথ দেখিয়েছিলেন বলেই আজ আমরা ছবি আঁকা শিখছি। এ বিষয়ে পড়াশোনা করছি। এ প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে পরবর্তীকালে দেশের শিল্পশিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন বেশকিছু শিল্পী। প্রথম ব্যক্তির ১২তম শিল্পীর মধ্যে পরবর্তীকালে দুজন ব্যক্তিমান শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। একজন শিল্পী আমিনুল ইসলাম এবং দ্বিতীয়জন শিল্পী সৈয়দ শফিকুল হোসেন। অন্য দশজনের বেশিরভাগই চিত্রশিল্পী হিসেবে বা চিত্রকলাকে পেশা হিসেবেই গ্রহণ করে সমাজে চিত্রশিল্পের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। আমিনুল ইসলাম বাংলাদেশের শিল্পকলা চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছেন। বাংলাদেশের দীর্ঘ সময়ের শিল্পকলার ধারাবাহিক উন্নতি ও প্রতিষ্ঠায় তাঁর বিশাল অবদান রয়েছে। আমিনুল ইসলাম ও সৈয়দ শফিকুল হোসেন চারুকলা ইনস্টিটিউটে অধ্যক্ষ হিসেবেও দীর্ঘদিন নিয়োজিত ছিলেন।

পাঠ : ৭ ও ৮

চারুকলা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেই শিল্পী জয়নুল আবেদিন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতা শিল্পীরা ক্ষান্ত থাকেন নি। শিল্পীরা যাতে সমাজের প্রয়োজনে নানাভাবে ছবি আঁকাকে কাজে লাগাতে পারে সে দিকেও তাঁরা নজর দিয়েছিলেন। সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিল্পীদের জন্য সম্মানজনক পদ তৈরি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চিত্রশিল্পের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে জনমত তৈরির জন্য শিক্ষক ও ছাত্ররা যৌথভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। এই চেষ্টা ছিল একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন। কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। অন্তত দশ থেকে বারো বছর লেগেছে সমাজকে ও রাষ্ট্রকে বোঝাতে যে, একটা সুন্দর সমাজ ও সুন্দর রাষ্ট্র তৈরিতে চিত্রশিল্প অন্যান্য পেশার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন- প্রকৌশলী, ডাক্তার, শিক্ষক, প্রশাসক, স্থপতি, অভিনেতা, সংগীতশিল্পী উন্নত সমাজের জন্য প্রয়োজন, তেমনি চিত্রশিল্পীরাও সুন্দর সমাজ গঠনে বিশাল ভূমিকা রাখতে পারছে।

তাই খুব সহজেই বলা যায়, বাংলাদেশের শিল্পকলাকে যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য শিল্পী জয়নুল আবেদিন এক বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে সমানভাবেই সংগ্রাম করেছেন শিল্পী আনোয়ারুল হক, শিল্পী শফিউদ্দিন আহমেদ, পটুয়া কামরুল হাসান, খাজা শফিক আহমেদ, শফিকুল আমিন ও শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়া। প্রথম ১২ বছরের শিল্প শিক্ষায় যারা এসেছিলেন তাঁরাও সমান নিষ্ঠা নিয়ে তাঁদের গুরুত্বের সঙ্গে কাজ করেছেন। ফলে বাংলাদেশের নিজস্ব শিল্পচৈতন্যের একটি বৈশিষ্ট্য ও রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যা বাংলাদেশের শিল্পকলা চর্চাকে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছে দিয়েছে। এঁদের মধ্যে যাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে তাঁরা হলেন- কহিনুর চৌধুরী, রশীদ চৌধুরী, মৃজা বশীরা, আবদুর রাজ্জাক, আবদুল বাসেত, হামিদুর রহমান, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, সমরজিৎসার চৌধুরী, হাশেম খান, রফিকুল নবী, নিতুন কুন্ডু, দেবদাস চক্রবর্তী, আবু তাহের, মাহমুদুল হক, মনিরুল ইসলাম, আবুল বারক আগাণী প্রমুখ।

নমুনা প্রশ্ন

তল্ৰ বাক্যে টিক চিহ্ন (✓) দাও

১. য়াৰা ছবি আঁকেন তায়া হফেন- নাটশিল্পী/ চিত্ৰশিল্পী/ নৃত্যশিল্পী
২. য়াৰা নাটকে ও চলাচিলে অভিনয় করেন তায়া- কাব্যশিল্পী/ অভিনেতা/ চিত্ৰশিল্পী
৩. য়াৰা চমৎকার গান গাইতে পাবেন তায়া হফেন- অভিনেতা/ সংগীতশিল্পী/ নাট্যশিল্পী
৪. শিশুকে ছবি আঁকা শেখাবার জন্য প্রথমেই- ভালো করে নিয়ম-কানুন শিখিয়ে দিতে হয়/ প্রথমেই নিজের ইচ্ছেমতো আঁকতে দিতে হয়।
৫. সাধারণত- যষ্ঠ শ্রেণি থেকে ধীরে ধীরে ছবি আঁকার নিয়ম-কানুনগুলো জেলে শিশু ছবি আঁকা ভালো/ ১ম শ্রেণি থেকে নিয়মকানুন জেলে ছবি আঁকবে।
৬. আদিম মানুষেরা- ক্যানভাসে ছবি আঁকত/ গুহার গায়ে ছবি আঁকত/ কাগজে ছবি আঁকত।
৭. আদিম মানুষেরা ছবি আঁকার রং তুলি- শহরের দোকান থেকে সংগ্রহ করত/ নিজেরা মাটি, পতর চর্বি ও পাথর সূচালো করে তৈরি করে নিত।
৮. প্রায় পনেরো-ষোলো শতক পর্যন্ত শিল্পীরা- বড় বড় আঁট কলোজে গিয়ে ছবি আঁকা শিখত/ গুরু বা শিল্প শিক্ষকের ছবি আঁকার কাজে সহায়তা করতে যেয়ে গুরুর কাছেই শিখে নিত।
৯. পাকিস্তান সরকার- নিজেরাই আঁট কলোজ তৈরি করে তারপর শিল্পীদের ডাকেন/ চিত্ৰশিল্পী জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, শফিউদ্দিন আহমেদ, আনোয়ারুল হক, শফিকুল আমিন প্রমুখদের দাবির কারণে শিল্পশিক্ষার প্রতিষ্ঠান শুরু করেন।
১০. ছবি আঁকা শেবার প্রথম প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল- গভর্নমেন্ট আঁট কলোজ/ গভর্নমেন্ট আঁট ইনস্টিটিউট।
১১. গভর্নমেন্ট আঁট ইনস্টিটিউটের যাত্রা শুরু হয়- ১৪ই আগস্ট ১৯৪৭/ ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৮/ ২২শে আগস্ট ১৯৪৮।
১২. শিল্পকলা শিক্ষার নিজস্ব ভবন- বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদেই গভর্নমেন্ট আঁট ইনস্টিটিউটটির রাসা শুরু হয়/ নবাবপুরে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের মাত্র ২টি কামরায় শুরু হয়।
১৩. উন্নত সমাজ গঠনে প্রকৌশলী, ডাক্তার ও বিজ্ঞানীর মতো- চিত্ৰশিল্পীদেরও ভূমিকা রয়েছে/ চিত্ৰ শিল্পীরা শুধু নিজেদের জন্য ও প্রদর্শনী করার জন্য ছবি আঁকে।

সংক্ষেপে জবাব লেখ

১. শিশু বয়সে ও বিদ্যালয়ে পড়ার সময় কীভাবে ছবি আঁকবে?
২. বর্তমান বাংলাদেশে বা পূর্ব পাকিস্তানে কীভাবে, কোন সময়ে এবং কাদের চেষ্টায় শিল্পকলা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির প্রথম নাম কী ছিল?
৩. গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠায় জালা শিল্পীরা সরকারকে কোন কোন উদাহরণ দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বুঝিয়েছিলেন?
৪. প্রথম বছর কতজন ছাত্র ভর্তি হয়েছিল? তাদের সম্পর্কে লেখ?
৫. প্রথম ১২ বছরে শিক্ষা লাভ করে কোন কোন শিল্পীরা দেশের সংস্কৃতি বিকাশে ও শিল্পকলা শিক্ষায় অবদান রেখেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় চিত্রকলা সর্বকালে সব মানুষের ভাষা



শিল্পী ছয়নুল আবেদিন তাঁর স্বাতন্ত্র্য কাগজে ঐকে বুঝিয়ে দিলেন তিনি কী কী ভিনিস খাবেন।
সিদ্ধ খাবেন না ভাজি তাও ঐকে বুঝিয়ে দিলেন। মদ খাবেন না, সোঁটও আঁকলেন।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- সভ্যতার প্রথম ভাগে মানুষ যে চিত্রের সাহায্যে ভাব প্রকাশ করেছিল তা জানতে পারব।
- চিত্রকলার বা ছবির ভাষা দিয়ে কীভাবে সারা বিশ্বের মানুষ ভাব বিনিময় করতে পারে তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পৃথিবীর বিখ্যাত শিল্পী ও তাঁদের শিল্পকর্ম সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ : ১

মানুষ আদিকালের সেই গুহাজীবন থেকে শুরু করে কত দিক থেকে কতভাবে জয় করাতে শিখল পৃথিবীকে। মানুষ কেথা থেকে তরা করে আজ কেথায় এসে পৌঁছেছে। শুধু প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক নিয়েই তো মানুষের চলবে না। মূল সমস্যা হলো মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে। আদিম মানুষ যখন প্রাকৃতিক প্রতিকূলতায় জীবন ও জীবিকার জন্য সংগ্রাম করত এবং হিসে পতনের আক্রমণের ভয়ে সবসময় আতংকে থাকত। খুজির উপায় হিসাবে যাদু বিশ্বাস নিয়ে পাহাড়ের গায়ে বিভিন্ন আঁচড় কেটে ছবি এঁকে সংঘবদ্ধ হয়ে সেইসব প্রতিকূলতাকে জয় করেছে। কিন্তু কেন মানুষ ছবি এঁকেছিল? সেই রহস্যের কথা আমরা এখন জানব।



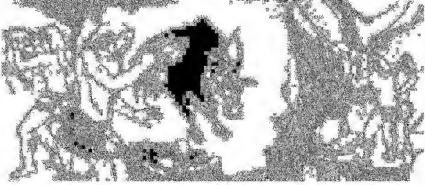
১৮৭৯ সালের কথা। স্পেনের উত্তরাঞ্চলে সাউটনা নামে এক জমিদার বাস করতেন। তার জমিদারি বেশ বড়। সেখানে ছিল অনেক পাহাড়। এখানে তিনি সন্ধান পেয়েছিলেন একটি গুহার। গুহার মধ্যে সন্ধান চালিয়ে কিছু পাওয়া যায় কিনা এ খোঁজালের বসে একদিন খনন কাজ আরম্ভ করে দিলেন। ভাবলেন গুহার মধ্যে খুঁজে যদি সেই আদিম মানুষদের হাড়শোড় আর পাথরের হাতিয়ার পাওয়া যায়। যথারীতি খুঁজতে শুরু করে দিল। সাথে তার পাঁচ বছরের ছোট মেয়ে। সে অবশ্য অতসব বোঝে না। সে বেরুলো বাবার হাত ধরে একটুখানি ঘুরে আসতে।

গুহায় ঢুকে বাবাভো হুঁকে পড়ে হাড়শোড় আর হাতিয়ার খুঁজতে লেগে গেলেন। কিন্তু ওইটুকু মেয়েটির এসব ব্যাপার ভালো লাগল না। সে একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে গুহার মধ্যে একটু আঁচড় এঁকি ওঁদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তার চোখ পড়ল গুহাটির এক জায়গায়। আর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি চিৎকার করে বলে উঠল বাবা, ষাঁড়! ষাঁড়! মেয়ের চিৎকার শুনে বাবা ছুটি এলেন, ভাবলেন গুহার মধ্যে সত্যিই কি ষাঁড় বেরিয়েছে?

না। ঠিক ষাঁড় নয়। তবু ঠিক ষাঁড়ের মতোই। ষাঁড়ের ছবি। ছোট এই মেয়েটির আবিষ্কারের কথা জানাজানি হয়ে গেল। বড় বড় পণ্ডিতেরা ওই আলতামিরা গুহায় গিয়ে হাজির। তারপর চলল প্রায় ষোলো বছর ধরে পণ্ডিত মহলে ওই ষাঁড়ের ছবি নিয়ে এক তর্ক-বিতর্ক, গবেষণা। আদিম মানুষের আঁকা প্রথম যে ছবি আবিষ্কার হয়েছিল তার বয়স প্রায় বিশ হাজার বছর। স্পেনের আলতামিরা, ফ্রান্সের লামুতে এবং লাসকো পর্বতগুহায় পাওয়া গেছে এর অন্তিম। জীবন-যাপন ও জীবনধারণের তথ্যে তারা ছবি আঁকাও শিখেছে। তারা মনের ভাব প্রকাশ করেছে ইশারায়, বিভিন্ন চিহ্ন এঁকে। এমন সময় ১৮৯৫-এ স্পেনে আবিষ্কার হলো আরও একটি গুহা। সেখানের গুহার দেয়ালে অবিস্কৃত হলো তাদের অনেক আঁকা-জোকা। কারা আঁকল এসব ছবি? নিশ্চয়ই সেই প্রাচীন যুগের মানুষেরা। সেই আদিম মানুষেরাই ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে প্রথম ছবির ব্যবহার শুরু করেছিল।

পাঠ : ২

ফ্রান্স, স্পেন, উত্তর আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের আরও অনেক আদিম মানুষের আঁকা ওহাচিত্র পাওয়া গিয়েছে। আর পকিতেরা হিসেব-পত্তর করে বলেছেন কোনো কোনো ছবির বয়স খ্রিস্টপূর্ব ১০,০০০ থেকে ৩০,০০০ পর্যন্ত হওয়া সম্ভব।



এই গল্পটির মধ্য থেকে আমরা জানতে পারলাম তার প্রকাশের প্রথম বাহন হিসেবে আদিম মানুষ ছবিকেই বেছে নিয়েছিল।

আজকের পৃথিবীর বুকে নানান দেশ, নানান দেশে নানান ধরনের মানুষ আবার তাদের ভাষাও ভিন্ন ভিন্ন। একজন মানুষের পক্ষে কখনো জানা সম্ভব হয়ে উঠে না ঐসব ভাষা। কিন্তু সেই দেশের জীবন, পরিবেশ ও প্রকৃতি নিয়ে যদি কোনো ছবি আঁকা হয় তাহলে অতি সহজেই সেই ছবি দেখে সেই দেশ সম্পর্কে জানা যাবে।

মনে কর আমাদের দেশে কোনো উৎসব উপলক্ষে জাপান, চীন সহ আরও অনেক দেশের শিল্পীরা সমবেত হয়েছে। তত্বেচ্ছা বিনিময় হয়তো আমরা সবাই সবার সাথে করতে পারব। কিন্তু নিজ নিজ দেশের পরিবেশ, পরিপার্শ্বিকতা, জীবন-যাপন, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়গুলো যদি আমরা নিজ নিজ ভাষায় ব্যক্ত করি তাহলে ভাষা না জানার কারণে তা জানতে পারব না। যদি আমরা নিজের দেশের পরিবেশ, প্রকৃতি, জীবন ও সংস্কৃতির বিষয়ে ছবি আঁকি তাহলে সেই ছবির বর্ণনার মাঝে আমরা প্রতিটি দেশের সার্বিক একটা চিত্র প্রত্যেকের ছবির মাঝে ফুটিয়ে তুলে সেই দেশের জীবনধারা, সংস্কৃতি ও পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ে নিজেদের মাঝে সু-সম্পর্ক তৈরি করতে পারব।

তাই একমাত্র ছবি বা চিত্রকণার ভাষা দিয়ে পৃথিবীর যে কোনো দেশ, যে কোনো জাতি, যে কোনো মানুষের সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ আমরা সহজেই বুঝতে পারি আর এ কারণেই বলা যেতে পারে চিত্রকলাই হচ্ছে আন্তর্জাতিক ভাষা।

কাজ: সকলে ভাবি আঁকি যে আন্তর্জাতিক ভাষা দশটি বাক্যে লিখে জানাতে হবে।

পাঠ : ৩

পৃথিবীর বিখ্যাত শিল্পী ও শিল্পকর্ম

আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত কত শিল্পী কত শত ছবি আঁকেছে। ওহাচিহের সেইসব শিল্পীর নাম যেমন আমাদের অজানা রয়ে গেছে। তেমনি পরবর্তী সময়ে কত দেশে কত শিল্পী ছবি আঁকেছে। সেইসব শিল্পীর মাঝ থেকে কেউ কেউ তাঁদের শিল্পসৃষ্টি দিয়ে জগৎ বিখ্যাত হয়েছেন। এই উপমহাদেশেও অনেক বরেন্য শিল্পী শিল্পসৃষ্টি করে চিত্রকলার ইতিহাসে আসন করে নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যামিনী রায়, নন্দলাল বসু প্রমুখ। তেমনি আমাদের দেশের পথিকৃৎ শিল্পীদের মধ্যে আছেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, কামরুজ্জ হোসান, এস এম সুলাতান, আনোয়ারুল হক। তাঁদের পরবর্তী সময়ে যে সকল স্বনামধন্য শিল্পী এ যাত্রাকে অব্যাহত রেখেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- কিবরিয়া, আমিনুল ইসলাম, হামিদুর রহমান, মুর্তজা বশীর, মুস্তাফা মনোয়ার, বশীর চৌধুরী, ক ইউয়ুম চৌধুরী, আব্দুর রাজ্জাক, আবদুল বাসেত, দেবদাস চক্রবর্তী, নিতুন কুন্ডু, হাশেম খান, রফিকুলনবী, মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।

পৃথিবীতে যে সকল শিল্পী তাঁদের চিত্রকলা ও ডাক র্ছ দিয়ে বিখ্যাত হয়েছেন- তাঁদের কয়েকজনের জীবন ও তাঁদের শিল্পকর্ম সম্পর্কে এবারে জানাব।

পাঠ : ৪

শিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯)

ইটালির ফ্লোরেন্স থেকে প্রায় ষাট মাইল দূরে ভিঞ্চি নামক একটি ক্ষুদ্র শহরে ১৪৫২ খ্রীষ্টাব্দে আনজিআলো নামক গ্রামে শিওনার্দোর জন্ম হয়। পিতা পাইরো দ্য ভিঞ্চি একজন বিশিষ্ট বিত্তশালী। তাঁর মাতার নাম ক্যাটরিনা। অটুট স্বাস্থ্য ও বুপের অধিকারী ছিল এই শিশু। পিতা পাইরো পুত্রের উন্নতির জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করতেন। বিপুল ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের মধ্যে শিওনার্দো প্রতিপালিত ও বেড়ে উঠেছেন। দুঃখের সাথে তার পরিচয় হয়নি কখনও। যে সময় শিওনার্দোর জন্ম হয়েছিল তখন ইটালির রেনেসাঁসের পূর্ব সময়। এই সময় ইউরোপে এক বৈপ্লবিক যুগ আরম্ভ হয়েছিল।

অশ্বারোহণ, সঙ্গীত, চিত্র, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, স্থাপত্য ও গণিতশাস্ত্রে ছিল লিওনার্দো পটীর অনুরাগ। ভিত্তি তার ছবির নানা দিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে লাগলেন। আকাশে উড়ন্ত পাখিদের গতি, ভারসাম্য ও দিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে তিনি বর্তমান যুগের উড়োজাহাজের আকৃতিবিশিষ্ট এক যন্ত্রের পরিকল্পনা করেছিলেন। অঙ্কনে মানব দেহের সৌন্দর্য সৃষ্টিতে যথাযথ উপায় খুঁজে পেতে মৃতদেহ কেটে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতেও বাদ রাখেন নি। শিল্পকলার ইতিহাসে ছাড়াও অন্যান্য দিক দিয়ে তাঁর যে গবেষণা ছিল তা পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের বহু আবিষ্কারে ভূমিকা রেখেছে। নানা বিষয়ে অসংখ্য অঙ্কন তিনি রেখে গেছেন।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকে তিনি প্রচুর গবেষণা করেছেন। তার চিন্তাতেনার ফসলের সূত্র থেকেই পরবর্তীকালের আকাশযান, স্থলযান ও জলযানের জন্ম, যা আধুনিক বিশ্বের বিশ্বয়।



শিল্পীর আঁকা ছবি 'মোনালিসা'

তাঁর জগৎবিখ্যাত
শিল্পকর্মের মধ্যে

শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি

মোনালিসা একখানি বিখ্যাত চিত্রকর্ম। ছবিটি এখন লন্ডনের প্রাসাদ মিউজিয়ামের সম্পত্তি। এর দৈর্ঘ্য তিনফুট, প্রস্থ দুইফুট। এই মহিলা ইটালির ফায়েনোকে সেল জুকেন্দো নামক এক ব্যক্তির পঁচিশ বছর বয়স্কা পত্নী। তাঁর মুখের সেই রহস্যময় হাসি আজও আমাদের কৌতূহলী করে। এছাড়াও তাঁর আরও বিখ্যাত ছবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- এ্যাডোরেসন অব দ্য কিংস, ভার্জিন অব দ্য রকস, ম্যাডোনা, শিশু ও সেই অ্যানি। ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে ২ মে, ৬৭ বছর বয়সে এই মহান শিল্পী লিওনার্দো মহাপ্রস্থান করেন।

বাক্য: লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি কি শুধু চিত্রশিল্পী? তাঁর আর কী কী প্রতিভা আছে— সকলে ভীষ্ম বাক্যে শিখে সেবাণ্ড।

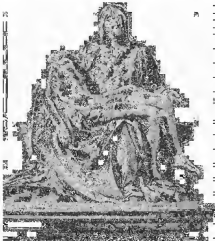
পাঠ : ৪

মাইকেল এঞ্জেলো (১৪৭৫-১৫৬৪)

১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্লোরেন্সের নিকটবর্তী ক্যাসেল ক্যাপরিজ নামক একটি ক্ষুদ্র শহরে মাইকেল এঞ্জেলোর জন্ম হয়। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। একাধারে চিত্রকলা, ভাস্কর্য স্থাপত্য ও কলাবিদ্যার প্রতি পুরস্কার আকর্ষণ লক্ষ্য করে পিতা পুত্রকে ১৩ বছর বয়সে গীরল্যান্ডাও এর নিকট শিল্পশিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। এখানে তিনি মাত্র তিন বছর শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। গীরল্যান্ডাও এর নিকট আগমনের পূর্ব থেকেই ভাস্কর্যে মাইকেল এঞ্জেলোর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। এখানে ভাস্কর্য চিত্র ও স্থাপত্য বিষয়েও তিনি জ্ঞান লাভ করেন।

মানুষের ছবি আঁকায় ভাস্কর্য সৃষ্টিতে এবং তার নিখুঁত সুন্দর লাবণ্য ফুটিয়ে তুলতেও তিনি ছিলেন অসাধারণ। মাইকেল এঞ্জেলোর জীবন গিওনার্দোর ন্যায় সুখে অতিবাহিত হয়নি।

কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে তিনি শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, অর্থ ও যশ অর্জন করেছিলেন। শিল্পী জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত



শিল্পীর বিখ্যাত ভাস্কর্য 'দা-পিয়েটা'



শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলো

- নিয়ে শেষ জীবন পর্যন্ত দুঃখেই পেয়েছেন। তবুও নিজের
- সৃষ্টির উপর গভীর আত্মবিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল তাঁর।
- মানব দেহের মাসপেশীর গড়ন, গতি-প্রকৃতির আসল
- রূপ দেখার জন্য শিল্পী গিওনার্দো দ্য ভিকির মতো
- তিনিও মৃতদেহকে কেটে দেখেছেন। সে অভিজ্ঞতার
- ফল তার আঁকা ছবি বা ভাস্কর্যে নজর দিলে সহজেই
- বোঝা যায়। শিল্পকর্মে তিনি মানব দেহের প্রতিটি
- অঙ্গ বা অংশ যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতেন।
- মাইকেল এঞ্জেলো ছবির চেয়ে ভাস্কর্য কর্মকেই অধিক
- পছন্দ করতেন এবং ভাস্কর্য কর্মের জন্যই তিনি
- অধিক বিখ্যাত। মূর্তিগুলি ধাতু ও প্রস্তরে নির্মিত
- হতো। তাঁর পিয়েটা ভাস্কর্য জগতে এক অবিনশ্বর সৃষ্টি।
- এই মূর্তি এখন রোমের সেন্ট পিটার্স গির্জার সম্পত্তি।
- ডেভিড মূর্তিটি ফ্লোরেন্সের একাডেমিতে আছে। বন্ড
- পেত আছে লুভার মিউজিয়ামে।

তবু ভাস্কর্য সৃষ্টিতেই নয়, চিত্রাঙ্কনেও তিনি ছিলেন সমানদ। ভ্যাটিকানের সিসটাইন

চ্যাপেলের ছাদে এবং দেয়ালের গায়ে মাইকেল এঞ্জেলো যে ফ্রেসকো এঁকেছিলেন তাঁর সে কাজগুলো আজও সকলে বিশ্বাস নিয়ে দেখে। এখানের চিত্রকলার সুন্দর রূপ দিতে তিনি ডাকর্ষের আকার আকৃতি ও কলা-কৌশল ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ মূর্তি নির্মাণের মতো সেখানেও তেমনি মানব দেহের সৌন্দর্য যুটিয়ে তুলেছেন। মাইকেল তাঁর কাজে পূর্বের প্রচলিত নিয়ম-কানুন, ধ্যান-ধারণা সব বদলে দিলেন। তাঁর শিল্পকর্মে সৃষ্টি করলেন নতুন চমক। তিনিই সর্ব প্রথম শিল্পী, যিনি সৌম্য দর্শন যুবকের রূপ লাভণ্যে সৃষ্টি করেছেন চিত্রকলা এবং ডাকর্ষে প্রেরিত নবী মহাপুরুষদের। তাঁর এ রকম শিল্পকর্মগুলো অতুলনীয় এবং রূপ লাভণ্য ও প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর। আমমকে জীবন দানের চিত্রটি সিগটাইন চ্যাপেলের ছাদে আঁকা রয়েছে তাতে আছে আশ্চর্যজনক দরদ সৃষ্টির পরিচয়। লাস্ট জাজমেন্ট ছবিটি এঁকেছিলেন পরবর্তীকালে যা অর্ধবহু নয় একেবারে সিগটাইন চ্যাপেলের ভেতরের অংশে এক অনবদ্য সৃষ্টি। তাঁর এই অপূর্ব সৃষ্টি কাজের ধার মনোলাজো বুপায়ল তার সময়ের যে কোনো শিল্পীর চেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিল পরবর্তী শিল্পীগণের শিল্প সৃষ্টির উপর।

মাইকেল এঞ্জেলো ছিলেন চিরকুমার। সাধু-সন্ন্যাসীদের ন্যায় জীবন-যাপন করেছিলেন। শেষ বয়সে শিল্পী মাইকেল অত্যন্ত বিটবিটে হলেও জনসাধারণ তাঁর প্রতিভার জন্য তাঁকে শ্রদ্ধা করত।

১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ মেম্ব্রয়ারি এঞ্জেলো বিখ্যাত পিরেটা মূর্তির পারের যে কিছু কাজ বাকি ছিল সেটুকু সম্পন্ন করতে গিয়ে জুরে আক্রান্ত হন। ১৭ তারিখ ডাক্তারের পরামর্শে তাঁকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে দেয়া হয়। তখন পূর্ণজ্ঞানে একটা উইল করার কথা বলেন। তাতে লেখা হয় ‘আমার আত্মা বিশ্বের জন্য রইল, দেহ রইল পৃথিবীর জন্য’ বেলা পাঁচটার এই মহান শিল্পী ৮৯ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

পাঠ : ৫

রাফায়েল সানজিও (১৪৮৩-১৫২০)

রাফেল আরবিনো নামক একটি পার্বত্য শহরে ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে গুড ফ্রাইডে তিথিতে রাফি ৯টায় জন্মগ্রহণ করেন। রাফায়েলের পিতা জিওভানি দ্য সানজিও ছিলেন একজন চিত্রশিল্পী ও সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ। রাফায়েল পিতার কাছেই ছবি আঁকার প্রথম অনুশীলন আরম্ভ করেন এবং দশ বছর বয়সে তিনি পিতার আঁকা ছবির উপর তুলি চালানোর অধিকার লাভ করেন। পিতা জিওভানি পুত্রের যোগে বছর বয়সে তাঁকে অংকশীল খ্যাতিমান শিল্পী পেরুজীনের নিকট প্রেরণ করেন। মাত্র তিন বছরে সেখানে তাঁর একচ্ছাতা এবং অধ্যবসায়ের ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে শিল্পীসমাজে তাঁর নাম জড়িয়ে পড়ে। রাফায়েলের সর্বোচ্চ মূল্যবান উদ্ভবনে হলো ছবি আঁকার বিশ্বরবস্তর যথাযথ সঠিকভাবে সাজানো। একমাত্র তার শিল্পকর্মে এ মূল্যবান উপায়টি দেখা যেত। আর কারো চিত্রকলায় যা দেখা যায় না।





শিল্পী আঁকা ছবি 'ম্যাডোনা'

নগর যখন রাক্ষসেদের স্তম্ভগানে মুখবিত্ত তখন তাঁর শত্রুশত্রু তাঁকে হত্যা করার জন্য ঘাতক নিযুক্ত করেছিল। রাক্ষসেদের ঘরের দরজা খোলা রেখেই মাতৃমূর্তি ছবিটি তখন আঁকছিলেন। ঘাতকদ্বয় ছবি আঁকা দেখে তাদের উদ্দেশ্য ভুলে যান। শিল্পীও তার 'রক্তাবসূলভাবে খুব যত্ন ও আশ্রয়ন করে তাদের নিকট ছবির ব্যাখ্যা করতে থাকেন। ঘাতকদ্বয় রাক্ষসেদের ব্যবহারে এতই অভিভূত হন যে তাদের পাপ উদ্দেশ্যের কথা প্রকাশ করে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে প্রস্থান করেন।

১৫২০ সালে মাত্র ৩৭ বছর বয়সে রক্ত স্রবিত্তে অস্থির হয়ে ছবি এই মহান শিল্পী পরলোক গমন করেন।

বাক্য : রাক্ষসেদের 'রক্তাব ও প্রকৃতি দিয়ে দশটি বাক্যে সকলে লিখে দেখাও।

রাক্ষসেদের ছিলেন একজন অতি বৃদ্ধবয়স পুরুষ। চরিত্রেও তেমন উজ্জ্বলতা, মন্ত্রতা, বিনয়, শালীনতা, ও পরোপকারী ছিলেন। একবার যিনি এই শিল্পীকে সম্পর্কে আসতে তিনিই আকর্ষিত হতেন। যৌবনের প্রথমে যশ ও অর্থ দুই তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু যশ বা অর্থের মোহ তাঁর 'রক্তাবকে কখনও প্রভাবিত করতে পারেনি। রাক্ষসেদের ও লিওনার্দো দুই মহান শিল্পীই ছিলেন পবন কৌতুকপ্রিয়। বিশ্বের রহস্য উন্মোচনে একজন ছিলেন গবেষক অপরদিকে রাক্ষসেদের ছিলেন সত্য অনুসন্ধানের মানুষ।

বেনেদ্যাস যুগে লিওনার্দো মাইকেল এঙ্গেলো ও রাক্ষসেদের এই তিন মহান শিল্পী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ছবি আঁকা আরম্ভ করেন। তাঁরা আলোচনা ও পরিশ্রমিত অনুশীলন করে পরবর্তী বেনেদ্যাস চিত্রশৈলীর মধ্যে নতুন দীপ্তি দান করেছিলেন।

তাঁর বিখ্যাত শিল্প সৃষ্টির মধ্যে প্রাক্তনের উপবিষ্ট ম্যাডোনা ছবিটি সৌন্দর্যের অতুলনীয় সৃষ্টি। রাক্ষসেদের সাধক জীবন সঞ্চে একটি সুখের গল্প প্রচলিত আছে। রোম

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. লিওনার্দো দ্য ভিন্সি ছন্দাঢ়াহণ করেন-

- | | |
|--------------|--------------|
| ক) ১৪৫২ সালে | খ) ১৪৪২ সালে |
| গ) ১৫৫০ সালে | ঘ) ১৪৮০ সালে |

২. কোন শিল্পী চিত্রকলা ও আঁকর্বে সমান দক্ষ ছিলেন-

- | | |
|-------------------------|-------------|
| ক) লিওনার্দো দ্য ভিন্সি | খ) রাফায়েল |
| গ) মাইকেল এঞ্জেলো | ঘ) পল সেজান |

৩. প্রান্তরে উপবিষ্ট ম্যাডোনা ছবিটি কার আঁকা?

- | | |
|------------|-------------------|
| ক) ভ্যানগগ | খ) রাফায়েল |
| গ) মাতিস | ঘ) মাইকেল এঞ্জেলো |

৪. আদিম মানুষের আঁকা প্রথম ছবি যে ছবি আবিষ্কার হয়েছিল- আনুমানিক তা-

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| ক) প্রায়- ১০ হাজার বছর আগে | খ) ২০ হাজার বছর আগে |
| গ) ৩০ হাজার বছর আগে | ঘ) ৪০ হাজার বছর আগে। |

৫. আণ্ডামিরা গুহাটি-

- | | |
|-------------|-----------|
| ক) ব্রপলে | খ) স্পেনে |
| গ) জার্মানে | ঘ) জাপানে |

নিচে শিল্পী ও শিল্পকর্মের নাম দেয়া হলো- পৃথক করে শিল্পীর নামের সামনে শিল্পকর্মের নাম লিখ-

লিওনার্দো দ্য ভিন্সি, পিয়োটো মূর্তি, শিত ও সেন্ট অ্যানি, রাফায়েল, মাইকেল এঞ্জেলো, প্রান্তরে উপবিষ্ট ম্যাডোনা।

সুন্দরশীল প্রশ্ন

গ্রীষ্মের ছুটিতে সামিয়া আর সিফাত বাবা-মার সাথে জাপান প্রবাসী ফুফুর কাছে বেড়াতে গেল। জাপানের প্রাকৃতিক পরিবেশ তাদের ভীষণ ভালো লাগল। ফুফুদের প্রতিবেশী 'সু' নামের একজন সমবয়সী ছেলের সাথে তাদের বন্ধুত্ব হলো।

(ক) সামিয়া ও সিফাত কোথায় বেড়াতে গেল?

(খ) সেখানে তারা নতুন করে কী দেখল?

(গ) জাপানের ভাষা না জানার কারণে 'সু' এর কাছ থেকে কীভাবে তাদের প্রকৃতি ও পরিবেশ

সম্পর্কে জানতে পারবে? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) 'চিত্রকলা সর্বকালে সব মানুষের ভাষা' বর্ণনা কর।

তৃতীয় অধ্যায় বাংলাদেশের লোকশিল্প ও কারুশিল্প

বাংলাদেশের মানুষ, প্রকৃতি ও জীবনযাপনের সাথে অভ্যস্ত নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে আমাদের লোকশিল্প ও কারুশিল্প। যষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা লোকশিল্প ও কারুশিল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছি। এ অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি লোকশিল্প ও কারুশিল্প সম্পর্কে জানব এবং আমাদের জীবন-যাপনের বিভিন্নক্ষেত্রে লোকশিল্প ও কারুশিল্পের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা লাভ করব।



বাংলাদেশের লোকশিল্প ও কারুশিল্পের ছবি

এ অধ্যায় পড়া শেষ করলে আমরা—

- বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি লোকশিল্পের বিবরণ দিতে পারব।
- বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি কারুশিল্পের বর্ণনা করতে পারব।
- লোকশিল্প ও কারুশিল্পের ব্যবহারিক ক্ষেত্রসমূহের বর্ণনা করতে পারব।
- আমাদের দৈনন্দিন জীবনে লোকশিল্প ও কারুশিল্পের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব।
- নিজের স্কুলে লোকশিল্প ও কারুশিল্পের তালিকা দিয়ে একটি পোস্টার তৈরি করতে পারব।

পাঠ : ১

বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি লোকশিল্প

বাংলাদেশের লোকশিল্পের ভূবন অনেক বিস্তৃত। আলপনা, নকশি পিঠা, নকশি সাঁচ, নকশি পাখা, শীতল পাটি, নকশিকাঁথা, নকশি শিকা, লোকচিত্র, খেলনা, পুতুল, শোলার কাজ, বাঁশ বেতের বেড়া, লোক-অলঙ্কার, লোকবাদ্যযন্ত্র, পোড়ামাটির ফলকচিত্র প্রভৃতি নিয়ে বাংলাদেশের লোকশিল্পের বিচিত্র জগৎ। বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও উৎসবে বিভিন্ন রকম লোকচিত্র তৈরি করা হয়। এর মধ্যে আছে মহররম সম্পর্কিত চিত্র, পটচিত্র, ঘটচিত্র, সরচিত্র, দেয়ালচিত্র, মুখোশচিত্র, পিঁড়িচিত্র ইত্যাদি। এ সমস্ত লোকচিত্র আমাদের লোকশিল্পের অংশ। বাংলাদেশের এসব বৈচিত্র্যপূর্ণ লোকশিল্পগুলোর মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি সম্পর্কে সংক্ষেপে জেনে নেয়া যাক।

আলপনা

আলপনা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান লোকশিল্প। বাঙালির বিভিন্ন উৎসবে আলপনা আঁকা হয়। এখন নববর্ষের অনুষ্ঠান, জন্মদিন, বিয়ে, গায়ে হলুদ এবং ২১ ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনারস্থল ও সড়কে আমরা আলপনার ব্যবহার দেখতে পাই। এছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠান, উৎসবের সৌন্দর্য ও জাকজমক বাড়িয়ে দিতে আমরা আলপনার ব্যবহার করি। যে কোনো শুভ কাজে আলপনা আঁকা আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির অনিচ্ছেদ্য ও অনেক প্রাচীন একটি রীতি। এর উদ্ভব হয়েছিল মূলত পাঁচান বাঙালি লোকজীবনের ধর্ম ও যাদু বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে। বিভিন্ন প্রকার পূজা ও ব্রত অনুষ্ঠানে আলপনা আঁকা হতো। যেমন লক্ষীপূজায় গোলাকার আকৃতির আলপনা দেবীর আসন বা ব্রতী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আলপনায় বহুল ব্যবহৃত একটি মোটিফ হচ্ছে কঙ্কি। কঙ্কি এখানে লক্ষ্মীর ধনভান্ডারের ধানে ভর্তি প্রতীক চিহ্ন। এই প্রতীক বা রূপক চিহ্ন দিয়ে আলপনা এঁকে লক্ষ্মী দেবীর পূজা করলে সংসারে সমৃদ্ধি আসবে। ধানে গোলা পরিপূর্ণ থাকবে। এই বিশ্বাস থেকে এমন আলপনা আঁকা হতো।

অন্যদিকে আমরা জানি যে আমাদের সামাজিক জীবনে যা পাবনু অংশা কনিস্টান্ট চেইনকিরি ব্রহ্মাশাসনব্রহ্মের ও আলপনা আঁকা হতো। ব্রতের আলপনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন মোটিফগুলো ছিল মনের কামনার এক একটি প্রতীক। পরবর্তী সময়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের গতি পেরিয়ে আলপনা বাঙালির সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষের শুভ অনুষ্ঠানের অংশ হয়ে ওঠে। এখন বিভিন্ন লোকজ মোটিফ যেমন-ফুল, পাতা, মাছ, পাখি ইত্যাদি এবং নানা রকম জ্যামিতিক ও প্রাকৃতিক আকৃতির ব্যবহার করে আলপনা আঁকা হয়। আলপনা আঁকার মাধ্যমে চালের গুঁড়া মিশিয়ে পিঠালি তৈরি করে তাতে ন্যাকড়া ভিজিয়ে উঠানে, ঘরের বারান্দায় ও মেঝেতে



আলপনা

আলপনা আঁকা হয়। চালের গুঁড়া ছিটিয়ে তার ওপর আঙ্গুল দিয়ে আলপনা আঁকার একটি প্রাচীন রীতি ছিল। ডালের গুঁড়া, পোড়া তুণ, ইটের গুঁড়া প্রভৃতি দিয়ে আলপনায় রঙের বৈচিত্র্য আনা হতো। গতানুগতিকতা ও বাঁধাধরা কিছু আকার-আকৃতি আলপনার একটি বিশেষ দিক হিসেবে গণ্য হতো। এই বাঁধাধরা আকার-আকৃতি বা নকশাকে মোটিক বলে। তবে আধুনিককালে আলপনা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ও পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে এর আঙ্গিক ও মোটিফের ক্ষেত্রে এসেছে পরিবর্তন। রঙের ব্যবহারে এসেছে বৈচিত্র্য। এখন প্রস্টিক রং ও বিভিন্ন রঙের অক্ৰাইড এর সাথে আইকা গাম মিশিয়ে তুলি দিয়ে আলপনা করা হয়।

সরাচিত্র

চিত্রিত বিভিন্ন প্রকার সরা লোকশিল্পের অন্তর্ভুক্ত। পাতিলের ঢাকনার নাম সরা। রান্নাঘরের কাজে ব্যবহৃত এ রকম সরা চিত্রিত হয় না। তবে এ ধরনের সরাচিত্র আঁকা হয় হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়ে অনুষ্ঠানের উপকরণ হিসেবে। সরাতে সাধারণত পদ্ম, প্রজাপতি ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য চিত্র আঁকা হয়। তবে সরাচিত্রের সব থেকে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে লক্ষীসরা। লক্ষীপূজায় লক্ষীসরা প্রধান উপকরণ। পূজার শেষে তা গৃহসজ্জার জন্য ঘরে রাখা হয়। লক্ষীসরাতে দেবী দুর্গার ছবির সাথে লক্ষীর ছবি থাকে। সাথে লক্ষী দেবীর বাহন পৈঁচর ছবিও থাকে। লোকজ রীতিতে উজ্জ্বল বিভিন্ন রং দিয়ে এসব ছবি আঁকা হয়। বর্তমানে সরাচিত্র আর শুধু ধর্মীয় বিষয়ে



লক্ষীসরা

আবদ্ধ নয়। এখন বিভিন্ন লোকজ বিষয় ও নানারকম নকশা দিয়ে সরা আঁকা হয়। এসব সরা বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে সাজ-সজ্জার কাজে ব্যবহার করা হয় এবং গৃহসজ্জাতেও ব্যবহার করা হয়। তাই এসব সরাচিত্র আমাদের লোক-সংস্কৃতির অংশ।

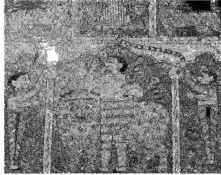
পট:

২ পট

বাংলার লোকশিল্পের অন্যতম একটি নিদর্শন হচ্ছে পট। বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করেই পটগুলো আঁকা হতো। পট বা কাপড় শব্দ থেকে পট শব্দের উৎপত্তি। জড়ানো পট ও সৌকা পট এ দুধরনের পট আঁকা হতো। আর এর শিল্পীরা পটুয়া নামে পরিচিত। জড়ানো পট বেশ বড় ও লম্বা আকারের হয়ে থাকে। একটা পটে পর পর লম্বাভাবে সাজানো থাকে অনেকগুলো টুকরো ছবি। এ ছবিগুলো কোনো লোককাহিনী বা ধর্মীয় কাহিনীর চিত্রবূপ। বুদ্ধের জীবনী, জাতকের গল্প, কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ, বেহুলা, লক্ষীন্দরের কাহিনী, মহররমের কাহিনী, সোনাই-মাধব এরকম বহু বিষয়ের উপর পট আঁকা হতো। পরবর্তীকালে লৌকিক পীর গাজীর জীবনের গল্প, কালুগাজী-চম্পাবতীর গল্প নিয়েও পট আঁকা হয়েছে। এগুলো গাজীর পট নামে খ্যাত।

এই পটগুলোর দুজোড়ে দুটি কাঠি লাগিয়ে তার সাথে জড়িয়ে রাখা হতো। কাপড়ের ওপর কাগজ লাগিয়ে তার ওপর চিত্র আঁকা হতো। তাছাড়া কাপড়ের ওপর আঠালো রং দিয়েও চিত্র আঁকা হতো। গ্রামে কিছু লোক এই পট নিয়ে ঘুরে ঘুরে পটের গল্প সুন্দর সুর করে বর্ণনা করেন। ছেলে-বুড়ো ও মেয়েরা সবাই ভিড় করে এসব পটের গল্প-কাহিনী শোনেন এবং খুব আনন্দ পান।

চৌক পট ছোট আকারের কাগজের ওপর আঁকা চিত্র। সাধারণত ১ ফুট লম্বা ও ৬ থেকে ৮ ইঞ্চি চওড়া হয়।



এগুলোর মধ্যে কালাঁঘাটের পট ছিল বিখ্যাত।

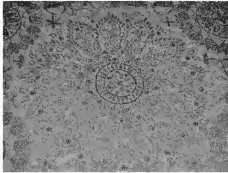
কালাঁঘাটের পটের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও শিল্পমান ছিল

অসামান্য। এগুলোতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের জীবন-যাপনের ভালো-মন্দ দিক, সামাজিক আচার-অনাচার ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান ইত্যাদির চিত্রায়ন করা হতো। মৃত ব্যক্তির স্মৃতিস্তম্ভের জন্য চন্দ্রদান পট নামে একরকম পট আঁকতেন পটুয়ারা। মৃত ব্যক্তির চন্দ্রবিহীন ছবি একে আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তাতে চোখ একে দেয়া হতো। যাতে করে সে স্বর্গের পথ দেখতে পায়।

পট : ৩

নকশিকাঁথা

নকশিকাঁথা বাংলাদেশের লোকশিল্পের সবচেয়ে আকর্ষণীয় নিদর্শন। শীতকালে গায়ে দেয়ার জন্য কাপড় কয়েক পরত



একসঙ্গে সাজিয়ে কাঁথা সেলাই করা হয়। এর মধ্যে কিছু কাঁথা তৈরি করা হয় নানা রঙের সুতায়, নানারকম নকশা করে। অনেক নকশা দিয়ে যে কাঁথা সেলাই হয় সেটাই হলো নকশিকাঁথা। গাঁয়ের মেয়েরা কাজের অবসরে দিনের পর দিন খেটে সুই-সুতায়, রং-বেরঙের ছবি ও নকশা কাঁথায় ফুটিয়ে তোলে। এইসব ছবিতে থাকে অনেক গল্প, অনেক কাহিনী। গাঁয়ের বধূ তার নিজের জীবনের সুখ-দুঃখের কথা সুই-সুতার ছবির মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলে।

এক-একটি কাঁথা বানাতে এক বছর, কখনও কখনও দুই বছর সময় পেরিয়ে

যায়। এক-একটি কাঁথার শিল্প নৈপুণ্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। কাঁথাতে যেসব নকশা থাকে তা হলো- ফুল, পাতা, পাছ-পালা, পল্ল, চাঁদ, তারা, পাখি, মাছ, নানারকম জীবজন্তু এমনকি ঘর-বাড়ি ইত্যাদি। আবার কিছু কিছু কাঁথাতে খেঁচা, বৃদ্ধ, গোলাকার ঘর, তিনকোনা ঘর এসব আদল বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করা হয়। একই আদল বা নকশার বারবার ব্যবহারকে 'মোটফি' বলে। ব্যবহারিক দিক থেকে নকশিকাঁথাকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন-

সুজনিপেড়ে, লেপকাঁথা, চাদর কাঁথা, জায়নামাজ, আসন কাঁথা, পাঙ্গির কাঁথা, রুমাল কাঁথা ইত্যাদি। বাংলাদেশে নকশিকাঁথা সেলাইয়ের দুটি মূলধারা বা রীতি আছে। তার একটি হলো যশোর রীতি, অন্যটি রাজশাহী রীতি। তাছাড়াও চট্টগ্রাম, খুলনা, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও নকশিকাঁথার উল্লেখযোগ্য ধারা আছে। যশোর অঞ্চলের নকশিকাঁথা বাংলাদেশের শীর্ষস্থানে অবস্থিত। এ অঞ্চলের কাঁথার ফোঁড় অত্যন্ত সূক্ষ্ম, রং রুচিসম্মত। ধর্মীশ মেলায় এই কাঁথা কোনেনাদিন বিক্রি হয় না। নিজেদের উদ্দেশ্যে এই কাঁথা তৈরি হয়। তবে অপরের ফরমাসে পারিশ্রমিকের বিনিময়েও নকশিকাঁথা তৈরি করা হয়। আজকাল শহরের কারুশিল্পের দোকানে নকশিকাঁথা বেচাকেনা হতে দেখা যায়। এমনকি বিদেশের বাজারেও আমাদের এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পের বিক্রয় হয়ে থাকে।

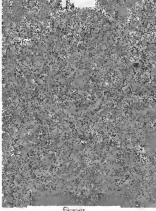
পোড়ামাটির ফলকচিত্র বা টেরাকোটা

পোড়ামাটির ফলক বাংলাদেশের আদি ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প এবং খুবই বিখ্যাত। মধ্যযুগে বিভিন্ন ভবন ও স্থাপনাতে, বিশেষ করে মন্দির, মসজিদ ইত্যাদির দেয়ালে এ ফলকচিত্র ব্যবহার করা হতো। পোড়ামাটির ফলকচিত্র বা এলংথংপড়ংথং হচ্ছে মাটির পাসিতনের বা ফলকের সমান জমিনের উপর ছবি বা নকশা উঁচু উঁচু হয়ে থাকে এমন রিসিফ গুয়ার। এটা বানানোর জন্য প্রথমে কাঁচা মাটি দিয়ে ফলকগুলো তৈরি করে তারপর পুড়িয়ে নেয়া হয়। তাই এগুলোকে বলে পোড়ামাটির ফলক। বগুড়ার মহাস্থানগড়ে তথা প্রাচীন পুন্ড্র



নগরীর প্রত্নতাত্ত্বিক খননে বাংলাদেশের সবচেয়ে

প্রাচীনতম ফলকচিত্র পাওয়া গেছে। মহাস্থানগড়ের এবং দিনাজপুরের কাঙালী মন্দিরের ফলকচিত্রের বিষয়বস্তু নরনারী ও দেব-দেবী। অন্যদিকে পাহাড়পুর ও কুমিল্লার ময়নামতির ফলকগুলোতে তৎকালীন সমাজ ও নিসর্গের ছবি পাওয়া যায়। বাঘা মসজিদের বা টাঙ্গাইলের আদিনা মসজিদের ফলকচিত্রের বিষয়বস্তু ফুল, লতা-পাতা ও জ্যামিতিক নকশা। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক বিভিন্ন বিষয় ও আকৃতি নিয়ে টেরাকোটা তৈরি হচ্ছে। বিভিন্ন অফিস ও বাসা-বাড়ির অভ্যন্তরীণ সাজ সজ্জা ও ভবনের বাহিরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এখন প্রচুর টেরাকোটা ব্যবহার করা হচ্ছে।



রিকশা

পাঠ : ৪

বাংলাদেশের এখন কয়েকটি কারুশিল্প

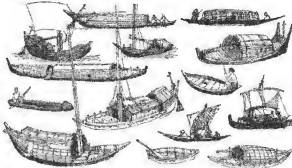
বাংলাদেশের নিত্যব্যবহার্য বিভিন্ন জিনিস যেমন- দা, কুড়াল, খস্তা, কাঁচি, যাতী, লাঙ্গলের ফলা, হাঁড়ি, পাতিল, কলসি, মটকা, তামা, কাঁসা-পিতলের অনেক জিনিস এবং নৌকা, রিকশা, খাট-পালঙ্ক, দরজা ইত্যাদিতে সৌন্দর্য আরোপের জন্য এসবের গায়ে আঁচড় কেটে, খোদাই করে, কখনোবা আলাদা করে লাগিয়ে লতা, পাতা, ফুল, পাখি, বিভিন্ন জীবজন্তু ইত্যাদির ছবি বা নকশা আঁকা হয়। কাবুকাজ করা এসব ব্যবহার্য সামগ্রীকে আমরা কারুশিল্প বলি। আমাদের দেশে বহু প্রকার কারুশিল্প আমরা ব্যবহার করি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারুশিল্প সম্পর্কে এখানে আমরা জানব।

রিকশা

বাংলাদেশের সুন্দর কারুশিল্প হিসেবে রিকশা দেশে ও বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছে। তিন চাকা বিশিষ্ট রিকশা চেহারা ও আকৃতির দিক থেকে একটি শিল্পকর্ম। তদুপরি বাঁশ, প্রাস্টিক ও কাপড় দিয়ে ফুল, পাতা, পাখির নকশা কেটে সেলাই করে রিকশাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলা হয়। রিকশার হ্যাভেলের দুপাশে কখনও কখনও দুটি ফুলদানি স্থাপন করে তাতে প্রাস্টিকের ফুল লাগানো হয়। আবার ছতের চারপাশে রঙিন বুননুনি বুলিয়ে সাজানো হয়। এতে করে রিকশা চলার সময় বুননুনির ছন্দময় শব্দ হয়। প্রতিটি রিকশার সিতের পেছন দিকে সুন্দর ছবি একে তা লাগিয়ে দেয়া হয়। সবমিলিয়ে রিকশা একটি আকর্ষণীয় কারুশিল্প।

নৌকা

নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌকা অত্যন্ত পরিচিত একটি বাহন। এটি শুধু জলপথেই নির্ভরযোগ্য ও বহুল ব্যবহৃত বাহনই নয় বরং আমাদের কারুশিল্পেরও উজ্জ্বল নিদর্শন। নৌকার চেহারা ও গড়নের দিক থেকে যেমন শিল্প নৈপুণ্য



রয়েছে, এমনি কাঁচ খোদাই

করে নৌকার গায়ে অনেক কাবুকাজ করা হয়। নৌকা তার চেহারার কারণে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন- গয়না, পানসি, বজরা, কোশ, সারঙ্গ, সাম্পান, হীপ, জেলেনাও ইত্যাদি। অতীতে ময়ূরপঙ্খী, চিত্রাটোটি প্রভৃতি নামের

নৌক ছিল। গগুই ও অন্যান্য অংশের গড়ন ময়ূর, টিয়া ইত্যাদি পাখির অনুকরণে করা হতো। নৌকার গোশুইতে পিতলের দুটি চোখ, পিতল ও এগুমিনিয়ামের পাত ইত্যাদি বসিয়ে নৌকা অলংকৃত করা হয়। পন্ন, চাঁদ, তারা প্রভৃতি মেটলিক তার শোভা বর্ধন করে।

পাঠ : ৫

কার্টের বেড়া ও পাগল

কার্টের তৈরি বেড়া ও খাট-পাগল বাংলাদেশের অতি প্রাচীন কারুশিল্প। কার্টের বেড়াতে সুন্দর কারুকাজ করে তাতে সিংহ, হাতির মুখ, পন্ন ইত্যাদি মেটলিফের ব্যবহার করা হতো। কার্টের বেড়া একদা হরদপুর অঞ্চলের একটি জনপ্রিয় শিল্প ছিল। দরজার ভেতরের দুপাশে লতা-পাতা মাঝখানে থাকে দুটি সিংহ। সিংহদ্বয়ের ঐতিহ্য থেকে এ রীতির প্রবর্তন হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। কার্টের বেড়ার মতো কার্টের পাগলও বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প। লানারকম কারুকর্ম বচিত পাগল বা খাট বহু প্রাচীন কাল থেকে এদেশের ঘরে ঘরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অতীতে পাগলের পায়্য বাঘ-সিংহের খাবার মতো করে বোদাই করা হতো। কবলোবা তা পরীর মতো করে বোদাই করা হতো। জাতীয় জাদুঘরে রত দুটি পাগলের পায়্য, মশারির স্ট্যান্ড পরীরা খেন ধারণ করে আছে। তাছাড়া আছে লতা-পাতার বিচিত্র অলংকরণ। গ্রাম অঞ্চলে সচরাচর একজোড়া ময়ূর দিয়ে খাট-পাগলের মাথার দিকের কাঠ অলংকৃত করা হয়।

কার্টের তৈরি অলংকৃত দরজা

প্রাচীনকাল থেকেই কার্টের তৈরি কারুকর্ম বচিত দরজা আমাদের কারুশিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে। ফুল-লতা-পাতার নকশা ছাড়াও সিংহ, হাতি প্রভৃতি প্রাণীর মুখ বোদাই করে দরজা অলংকৃত করা হতো। সুরম্য ভবনের বিশাল আকৃতির কারুকর্ম বচিত দরজা ভবনের সৌন্দর্য ঘিণ করে দিত। এবনো সৌমিন বাঙালিরা তাদের বাসগৃহে কারুকর্মময় দরজার ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের বৃতিবোধের পরিচয় দেয়।

বাংলাদেশের অসংখ্য কারুশিল্প থেকে উপরে মাত্র কয়েকটি নিয়ে আলোচনা হলো। আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা লোকশিল্প ও কারুশিল্প সম্পর্কে আমরা আরও সচেতন হলে এ সকল বিষয়ে আরও জানতে পারব। বাংলাদেশের এক এক অঞ্চলে এক এক লোকশিল্প ও কারুশিল্প শিল্পগুলোর জন্য, নিপুণ কাজের জন্য ও সৌন্দর্যের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছে। তোমরা যখন যে কারুশিল্প বা লোকশিল্প হাতের কাছে পাবে সেটি সম্পর্কে ভালোভাবে বোঝ-ববর নিয়ে গেনে নেবে।

পাঠ : ৬

বাংলাদেশে লোকশিল্প ও কারুশিল্পের ব্যবহারিক ক্ষেত্রসমূহ

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে লোকশিল্প ও কারুশিল্পের উল্লেখযোগ্য ব্যবহার রয়েছে। ঘৃণা ঘৃণা ঘরে এ সমস্ত শিল্প আমাদের জীবনে ও তত্ত্বপটভাবে মিশে আছে। নিচে বিভিন্ন ক্ষেত্রে লোকশিল্প ও কারুশিল্পের ব্যবহার উল্লেখ করা হলো।

জীবন-বাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে লোকশিল্পের ব্যবহার

বাংলাদেশের লোকশিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে মাটি, কাঠ ও কাপড়ের তৈরি নানারকম রত্নিন বেলনা। এগুলো শিল্পমানের সাথে সাথে ছোট শিশুদের খেলনা হিসেবেও খুব জনপ্রিয়। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের শিশুরা এসব মন ভোলানো খেলনা দিয়েই তাদের রত্নিন শৈশব পার করে। আবার পাটের তৈরি শিকা, ফ্লোরমাট, টেবিলমাট ইত্যাদির ব্যবহারিক উপযোগিতা রয়েছে। গ্রামেগঞ্জে ঘরে ঘরে এগুলো ব্যবহার করা হয়। লোকশিল্পের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ও বহুল ব্যবহৃত উপাদানটি নকশিকাঁথা। মনোরম এই শিল্পটি শিল্পগুণ ও মানে যেমন সেরা তেমনি গ্রামেগঞ্জে এমনকি শহরেও সমানভাবে এর ব্যবহার হয়। শীতে এ কাঁথার ব্যবহার হয় ঘরে ঘরে। এমনকি দেশের বাইরেও এর জনপ্রিয়তা ও চাহিদা আছে। অন্যদিকে লাক্ষীসরায় হিন্দুদের লাক্ষীপূজার একটি প্রধান উপকরণ। তেমনি আগলপনা, দেয়ালচিত্র ইত্যাদি বাঙালির উৎসব অনুষ্ঠানের অংশ হয়ে উঠেছে। বর্ষবরণ, পূজা, বিয়ে, জন্মদিন, গায়ে হতুদ, শহীদ দিবস সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আগলপনা ও দেয়ালচিত্রের ব্যাপক ব্যবহার করা হয়। এগুলো অনুষ্ঠানকে জাঁকজমকপূর্ণ ও রত্নিন করে তোলে।

নকশি পিঠা বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলের খুবই জনপ্রিয় একটি বাবার। শীতে এই পিঠা দিয়ে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে আপ্যায়ন করা হয়। এসব নকশি পিঠা শুধু দেবতেই সুন্দর নয়, বেতেও সুবাসু। বাঙালির যে কোনো উৎসব, অনুষ্ঠান ও বিয়ে এই পিঠা ছাড়া হতো না। এখনো এই পিঠা বিয়ে ও সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রিয় বাবার।

অন্যদিকে নকশি পাখার ব্যবহার গরমের দিনে গ্রামের সাথে সাথে শহরেও দেখা যায়। মধ্যযুগে টেরাকোটা বা পোড়া মাটির ফলকচিত্র বিভিন্ন স্থাপনা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের দেয়ালে স্থাপন করা হতো ভবনের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য। বর্তমানে আধুনিক বিষয় ও প্রকৃতি নিয়ে প্রচুর টেরাকোটা করা হচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বাসা-বাড়ি ইত্যাদিতে এ সমস্ত টেরাকোটার সৌখিন ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। তাই আমরা বলতে পারি যে, লোকশিল্প শুধুমাত্র একটি শিল্প মাধ্যম নয় বরং এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে থাকে। আমাদের জীবনকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করার জন্য লোকশিল্পের ভূমিকা ব্যাপক।

জীবনবাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কারুশিল্পের ব্যবহার

লোকশিল্পের মধ্যে কারুশিল্পও আমাদের জীবনবাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা জানি যে, ব্যবহারিক বিভিন্ন সামগ্রী বা বস্তুকে অলংকৃত করা হলেই সেটা হয় কারুশিল্প। সুতরাং সহজেই বোকা যায় যে, সমস্ত কারুশিল্পই আমাদের ব্যবহারিক কাজে লাগে। যেমন— বাঁশ, বেত ও কাঠের তৈরি কারুকর্মময় বিভিন্ন আসবাব আমাদের গৃহের সৌন্দর্য যেমন বাড়ায়, তেমনি এগুলো আমাদের শোয়া, বসা, জামাকাপড় সংরক্ষণ, বাবার রাখা থেকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার হয়। মাটির তৈরি কারুকর্মময় বিভিন্ন হাঁড়ি, পাতিল ও বাসন-কোসন গ্রামের সাধারণ মানুষের ঘর সংসারের প্রধান উপকরণ আবার তামা, কাঁসা ও পিতলের তৈরি বিভিন্ন নকশা করা তৈজসপত্রও আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি। সুন্দর অলংকার ও শাড়ি বাংলাদেশের মেয়েদের নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী। নকশা করা খাট, পাগড়, দরজা, আগলমারি এসব যেমন আমাদের সুসুচারি পরিচয় দেয় তেমনি দৈনন্দিন জীবনে এসবের ব্যবহার অপরিহার্য। তাই বলা যায়, এসব শিল্প আমাদের জীবনবাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. "আগপনা" বাংলাদেশের অন্যতম

প্রধান-ক. কারুশিল্প

খ. গোকশিল্প

গ. কুটিরশিল্প

ঘ. দারুশিল্প

২. চৌকপটের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে-

ক. গাজীপুরপট

খ. চকুদানপট

গ. কাপীঘাটেরপট

ঘ. হাঁওপট

৩. বাংলাদেশের শীর্ষস্থানে অবস্থিত-

ক. রাজশাহী অঞ্চলের নকশিকাঁথা

খ. ফরিদপুর অঞ্চলের

গ. হাশের অঞ্চলের নকশিকাঁথা

নকশিকাঁথা ঘ. চট্টগ্রাম অঞ্চলের

৪. বাংলাদেশের সবচেয়ে শাটিন পোড়ামটির ফলকচিত্রের মিসিরকান্দাওয়া গেছে-

ক. বগুড়ার মহাছালগড়ে

খ. কুমিল্লার ময়নামতিতে

গ. দিনাজপুরের কান্তলী মন্দিরে

ঘ. রাজশাহীর বাঘা মসজিদে

৫. কাঠের তৈরি বেড়া ও খাট-পালঙ্ক বাংলাদেশের অতিপ্রাচীন-

ক. লোকশিল্প

খ. হস্তশিল্প

গ. কুটিরশিল্প

ঘ. কারুশিল্প

নিচের শব্দগুলো পাশাপাশি বসিয়ে মিথ্য কর-

বাম	ডান
কঙ্কি	নকশিকাঁথা
জড়ানো	কারুশিল্প
সুজশিপেড়ে	আগপনা
রিকশা	নৌকা
মহুরপাখী	পট

সুজনশীল প্রশ্ন

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রীতে সৌন্দর্য আরোপ করার জন্য নানারকম কাবুকাজ করা হয়। এ সমস্ত কাবুকাজ করা ব্যবহার সামগ্রীকে আমরা বলি কার্লুশিল। আমাদের দেশে হরেক রকম কার্লুশিল আছে। এর মধ্যে বাঁশ, বেত ও কাঠের তৈরি কার্লুশিল খুবই বিখ্যাত। তাছাড়া তামা, কাঁসা, পিতল, সোনা, রূপা প্রভৃতি ধাতুর তৈরি কাবুকাজ যচিত বিভিন্ন বাসনপত্র ও গয়না আমাদের উল্লেখযোগ্য কার্লুশিল। যানবাহন হিসেবে ব্যবহৃত রিকশা, বিভিন্ন ধরনের নৌকা ও পার্গকি আমাদের সুন্দর কার্লুশিল।

ক. কার্লুশিল কাকে বলে?

খ. কাঠ দিয়ে তৈরি হয় এমন ৫টি কার্লুশিলের নাম লেখ।

গ. প্রতিদিন আমরা নানারকম কার্লুশিল ব্যবহার করি- সুনির্দিষ্ট উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা

কর। ঘ. 'সমাজের অগ্রগতির সাথে সাথে কার্লুশিল বিকাশ লাভ করছে'-বিশ্লেষণ কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

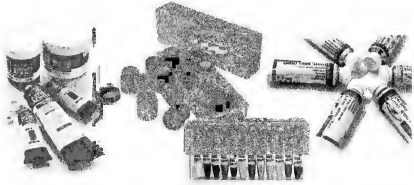
১. বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করে নকশিকাঁথা সম্পর্কে একটি বিবরণ দাও।

২. বাংলাদেশের জনপ্রিয় বাহন ও সুন্দর কার্লুশিল রিকশা সম্পর্কে একটি বিবরণ দাও।

চতুর্থ অধ্যায়

ছবি আঁকার বিভিন্ন মাধ্যম

ছবি আঁকার বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে। পেনসিল, কলি-কলম, জল রং, তেল রং, প্যাস্টেল রং, এ্যাক্রেলিক রং সহ বিভিন্ন মাধ্যমে ছবি আঁকা যায়। এ অধ্যায়ে আমরা ছবি আঁকার মাধ্যম- পোস্টার রং, এ্যাক্রেলিক রং ও জল রং সম্পর্কে জানব।



বিভিন্ন মাধ্যমের রং

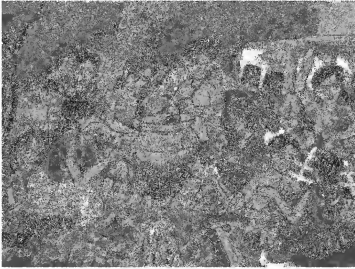
এ অধ্যায় পড়া শেষ করলে আমরা-

- পোস্টার রং এবং তার ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারব।
- এ্যাক্রেলিক রং এবং তার ব্যবহারবিধি বর্ণনা করতে পারব।
- জল রং এবং তার প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ : ১

পোস্টার রং

ছবি আঁকার জন্য ছোটদের কাছে প্রিয় একটি মাধ্যম হচ্ছে পোস্টার রং। এটি মূলত পানি মাধ্যমের রং (থিংক নথরংবফ)। এই রং পানি দিয়ে মিশিয়ে আঁকতে হয়। তবে পোস্টার রংকে বলা যায় অখচ্ছ জল রং। জল রঙের তুলনায় পোস্টার রং ভারী ও মোটা। একে অখচ্ছ রং বলা যায়। কারণ হলো, একটির উপর অন্য একটি রঙের প্রলেপ দিলে আগের রংটি সম্পূর্ণ ঢেকে যায়। আগের রঙের অঙ্কিত্ব হারিয়ে যায়। পোস্টার রং বিভিন্ন শেডে বা নানা রঙে কাঁচের শিশিতে পাওয়া যায়। ঘন পেস্টের আকারে শিশিতে সংরক্ষিত থাকে। রং শিশি থেকে বের করে পানি দিয়ে পরিমাণমতো তরল করে কাগজে ব্যবহার করা হয়। পোস্টার রং দিয়ে সাধারণত কাগজেই ছবি আঁকা হয়। একটু খসখসে জমিনের কাগজে পোস্টার রং ব্যবহার করতে সুবিধা। ছবিতে উজ্জ্বলতা ধরে রাখতে একাধিক তুলি এবং যতাসম্ভব পরিষ্কার পানি ব্যবহার করা উচিত। পোস্টার রং দিয়ে যে কোনো ধরনের ছবি আঁকা সম্ভব।



পাঠ : ২

এ্যাক্সেলিক রং

এ্যাক্সেলিক রং টিউব আকারে ছাড়াও কাঁচের এবং প্লাস্টিকের কৌটায় ছোট-বড় বিভিন্ন আকৃতিতে পাওয়া যায়। ঘন পেস্টের আকারে সংরক্ষিত এই রং পানি দিয়ে তরল করে ছবি আঁকা যায়। এ্যাক্সেলিক রং দিয়ে কাগজ, বোর্ড বা ক্যানভাস যে কোনোটিতেই ছবি আঁকা সম্ভব। এটিও মূলত অখচ্ছ রং। তবে পাতলা করে গুলিয়ে গুল রঙের মতো ব্যবহার করা চলে। রং খুব দ্রুত শুকিয়ে যায় বলে তাড়াতাড়ি ছবি আঁকা যায়। ফলে শিল্পীদের কাছে এ সময়ে

এ্যাক্রেলিক রং খুবই প্রিয় একটি মাধ্যম। এ্যাক্রেলিকে সব রং-ই পাওয়া যায়। বাজারে প্রাস্টিক রং নামে যে রং পাওয়া যায় সেটিও মূলত এ্যাক্রেলিক। তবে তা এ্যাক্রেলিক রং থেকে অপেক্ষাকৃত তরল। প্রাস্টিক রং পানি মিশিয়ে আঁকতে হয়।

পাঠ : ৩ ও ৪

জল রং

যে রং পানির সাথে মিশিয়ে ছবি আঁকা হয় এবং যে রং ঝেঁষ তাকে বলা হয় জল রং। জল রং রঙের বাজারে ছোট ছোট বোঁপে চারকোলা ট্যাবলেটের মতো থাকে। আলাদা আলাদা ট্যাবলেট অবস্থায়ও পাওয়া যায়। তবে টিউবের মধ্যে পেস্টের (মতো অবস্থায়ও জল রং তৈরি হয়ে থাকে। জল রং ও পোস্টার রং কাছাকাছি হলেও গুণগত দিক থেকে অনেকটা ভিন্ন। জল রং শুষ্ক ও পাতলা। একটি রঙের ওপর আরেকটি রং দিয়ে আঁচের রংটি ঢেকে দেয়া যায় না। ঝেঁষ হওয়ার কারণে দুটো রং মিলে অন্য একটি রং হয়। জল রং সাধারণত কাগজের ওপর ব্যবহার করা হয়ে থাকে। জল রং ছবি আঁকার জন্যে একটু মোটা ও বসবসে জমিনের কাগজ সবচেয়ে উপযোণী। আমাদের দেশে যে মোটা কাগজ পাওয়া যায় তাতে জল রঙে আঁকা যেতে পারে। বাদনের পক্ষে সড়ব তারা হ্যান্ডমেড কাগজ বা উন্নত ধরনের কাগজ জোঁগাড় করে নেবে।

জল রং ব্যবহারের নিয়ম

এক তা কাগজ কাগজ অর্ধেক করে কেটে নাও। ইচ্ছে করলে আরও ছোট করে নিতে পার। মনে রাখতে হবে কাগজ যেন দুমড়ে মুচড়ে বা ভাঁজ হয়ে না থাকে। কাটাও যেন সুন্দর হয়। কাগজটিকে হার্ডবোর্ডের ওপর ক্লিপ দিয়ে এমনভাবে আঁটকাও যেন টান-টান থাকে। বোর্ডকে মেঝেতে বা কোনো উঁচু জিনিসে হেলান দিয়ে তোমানের সামনে রাখ। একটা মণে পরিষ্কার পানি নাও। তার পাশে জলরঙে আঁকার জন্য বিশেষভাবে তৈরি প্যাণেট অথবা কয়েকটি সাদা পিরিত রাখ। সে সাথে রঙের টিউব বা রঙের কৌটাগুলি হাতের কাছে রাখ। এবার আঁকা শুরু করার আগে খুব ভালো করে ভেবে নাও কী আঁকবে। ধরা যাক, সাদা কাগো মেঝে ছাওয়া আকাশ আঁকবে। পেনসিলে হালকা দাগ দিয়ে মেঝের ড্রইং করে নাও। রাখার দিয়ে মোছামুছি না করলেই ভালো। বেশি ঘষলে কাগজের মসৃণতা নষ্ট হয়। রং লাগালে ঘষে দেওয়া স্থানে অপ্রয়োজনীয় দাগ দেখা দিতে পারে। ছবিও নষ্ট হতে পারে। রং লাগাবার আগে পরিষ্কার ডেকা ল্যাকড়া দিয়ে অথবা চওড়া তুলি দিয়ে কাগজটিকে ভিজিয়ে নাও। কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। দেববে কাগজের চুপচুপে পানি কিছুটা শুকিয়ে এসেছে। এবার পিরিতে রং নাও। কিছুটা বাদামি রংও নিতে হবে। পানির সাথে বাদামি, নীল রং তুলি দিয়ে গুলে নাও এবং চওড়া তুলি দিয়ে আখ-ডেকা কাগজে অলতো করে লাগাতে হবে। মনে রাখবে রং লাগানো শুরু করতে হবে কাগজের উপর থেকে। তুলি চাণাতে হবে বা দিক থেকে ডানে। পানির মতো রং নিচের দিকে গড়াবে। গড়ানো রংকে তাড়াতাড়িভাবে তুলি দিয়ে টেনে ওয়াশ শেষ করবে। এভাবে নীল রঙের ওয়াশ দেওয়ার সময় ড্রইং অনুযায়ী সাদা মেঝের অংশগুলো ছেড়ে যাবে। অর্থাৎ কাগজের সাদা যেন রয়ে যায়। এইভাবে নীলের ওয়াশ শেষ করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। রং কিছু শুকিয়ে এলে কাগো মেঝের কাজ শুরু করবে। এ জল নীল এবং কাগো মিশিয়ে আবার কাগো ও বাদামি মিশিয়ে দুটি পিরিতে আলাদা করে পরিমাণমতো রং তৈরি করে নাও। এরপর প্রথমে কিছুটা হালকা করে নীল এবং কাগো মেশানো রং ড্রইং অনুযায়ী কাগো মেঝের অংশে লাগাও। তারপর কাগো এবং বাদামি মেশানো রং গাঢ় করে বেশি অন্ধকার বোঝাতে আঁচের রঙের উপরেই কিছু অংশে লাগাও। দেববে ডেকা কাগজ এবং ডেকা রঙের ওপর এইভাবে রং লাগালে বৃষ্টির ডেকা ডেকা কাগো মেঝের ধরনটা এসে যাবে। এবার সাদা মেঝে কাগো আর বাদামি রংকে খুব হালকা করে মিশিয়ে যেখানে শেড প্রয়োজন সেখানে লাগাও।

তোমাদের ছবিটি আঁকা এখানেই শেষ। এখানে একটি সহজ পদ্ধতির কথা বলা হলো। এই পদ্ধতিতে খুব কম সময়ের মধ্যে একটি জল রঙের ছবি আঁকা যাবে। তবে বিষয় অনুসারে অনেক ধরনের রং প্রয়োজন হবে। আগেছায়া অনুযায়ী রঙের তারতম্য হবে এবং সময়ও বেশি লাগবে। শ্রেণিতে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বারবার অনুশীলন করে জল রঙের ব্যবহার আয়ত্ত করতে হবে।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জল রং হচ্ছে-

- ক. অ'ফস্ট রং
গ. ভারী রং

- খ. 'ফ্রস্ট রং
ঘ. তৈলমুক্ত রং

২. পোস্টার রঙে আঁকতে হয়-

- ক. তেল মিশিয়ে
গ. পানি মিশিয়ে

- খ. তারপিন মিশিয়ে
ঘ. গাম মিশিয়ে

৩. এ্যাক্রেলিক রং সংরক্ষিত থাকে-

- ক. ঘন পেস্টের আকারে
গ. রঙিন কাঠির আকারে

- খ. তরল কাগির আকারে
ঘ. কেক আকারে

৪. এ্যাক্রেলিক রং শিল্পীদের কাছে প্রিয়-

- ক. রং খুব দ্রুত শুকিয়ে যায় বলে
গ. রং মুছে যায় না বলে

- খ. রং উজ্জ্বল হয় বলে
ঘ. অল্প রং লাগে বলে

৫. জল রঙে ছবি আঁকা হয় সাধারণত-

- ক. ক্যানভাসে
গ. হার্ডবোর্ডে

- খ. কাগজে
ঘ. কাঠের টুকরাতে

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. নিচের রংগুলো থেকে শুধু কাগজে আঁকা যায় এমন রংগুলো আলাদা কর।

এ্যাক্রেলিক রং, প্রাস্টিক রং, জলরং, অক্সাইড রং, পোস্টার রং, টাইডাই, প্যাংস্টেল রং, তেল রং।

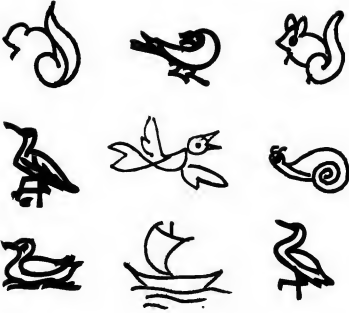
২. পোস্টার রং সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

৩. জল রং, ব্যবহারের নিয়মাবলি বর্ণনা কর।

৪. 'এ্যাক্রেলিক রং এখন শিল্পীদের প্রিয় একটি মাধ্যম'- কথাটির ব্যাখ্যা লেখ।

পঞ্চম অধ্যায়

ছবি আঁকার নানারকম আনন্দদায়ক অনুশীলন

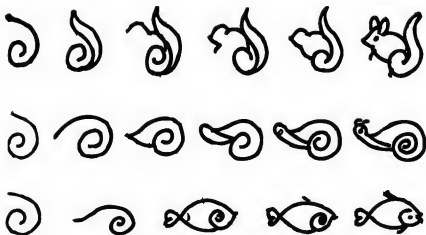


এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- সংখ্যা দিয়ে নানারকমের মজার মজার ছবি আঁকতে পারব।
- দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসের আকার আকৃতি, গঠন পরিমাপ বলতে পারব।
- মাছ ও পাখির আকৃতি দিয়ে নকশা আঁকতে পারব।
- নিজে কল্পনা করে বিভিন্ন ধরনের নকশা আঁকতে পারব।

পাঠ : ১

যে সকল ছবি একে আমরা আনন্দ পাব সেসব মজার মজার ছবি তৈরি করতে এখন জানব। ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা সাধারণ নিয়মের আলোকে ফুল, পাতা, নকশা ইত্যাদি শিখেছি। তোমরা নিজেরাই ইচ্ছেমতো ভালোভাবে ছবিগুলো আঁকবে। আমরা ছোটবেলা থেকে গণিত বা অংক কবতে গিয়ে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা ব্যবহার করে এসেছি। এখনও করছি এবং সারা জীবনই এ সংখ্যাগুলো আমাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হবে। মজার ব্যাপার হলো এই সংখ্যাগুলো দিয়েও যে মজার ছবি তৈরি করা যায় তা কি ভেবেছি? এবার আমরা এই সংখ্যাগুলো দিয়ে কিছু মজার মজার ছবি তৈরি করে নিজেরা যেমন আনন্দ পাব তেমনি বাবা, মা, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদেরও একে দেখিয়ে অবাক করে দিব।



সংখ্যা দিয়ে মজার অনুশীলন

KIR : সকলে ১ সংখ্যা দিয়ে তোমার নিজের মতো করে মজার অনুশীলন করে দেখাও।

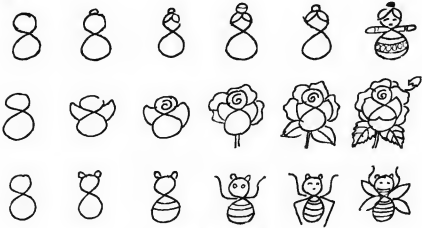
পাঠ : ২



সংখ্যা দিয়ে মজার অনুশীলন

কাজ : সকলে ২, ৩ সংখ্যা দিয়ে তোমার নিজের মতো করে মজার অনুশীলন করে দেখাও

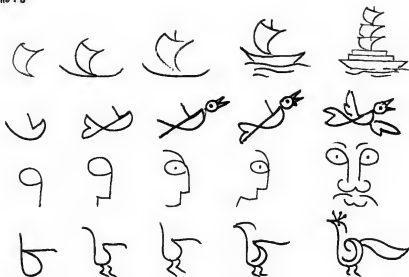
পাঠ : ৩



সংখ্যা দিয়ে মজার অনুশীলন

কাজ : সকলে ৪ সংখ্যা দিয়ে তোমার নিজের মতো করে মজার অনুশীলন করে দেখাও

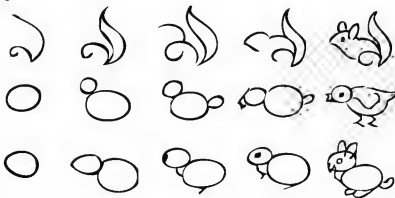
পাঠ : ৪



সংখ্যা দিয়ে মজার অঙ্কন

কাজ : ৫, ৬, ৭, ৮ সংখ্যা দিয়ে জোয়ার নিজের মতো করে মজার অঙ্কন করে দেখাও

পাঠ : ৫



সংখ্যা দিয়ে মজার অঙ্কন

কাজ : সকলে ৯, ০ সংখ্যা দিয়ে জোয়ার নিজের মতো করে মজার অঙ্কন করে দেখাও

ছবি আকার প্রাথমিক কিছু কথা

প্রতিদিন আমরা আমাদের চারপাশে যেসব জিনিস দেখি সেসব জিনিসের বাস্তবধর্মী ছবি আকার সময় তার আকার আকৃতির প্রতি খুবই সচেতন থাকতে হবে। কারণ এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা পূর্ব পাঠে আকার আকৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে এসেছি।

পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার বেশির ভাগই বৃত্ত, চতুর্ভুজ কিংবা ত্রিভুজের মাঝে আবদ্ধ। বিশেষ করে বৃত্ত ও চতুর্ভুজের মাঝে সব বিন্দুকে একটা আকারে প্রাথমিকভাবে বৃপদান করা যায়। বাস্তবধর্মী চিত্রাংকনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- আকার যতই বাড় কিংবা ছোট হোক না কেন, আকৃতি ঠিক রাখতেই হবে।

যেমন-



পূর্বেই বলেছি যে কোনো চিত্র অংকন মানেই কতগুলো রেখার সমষ্টি, সেটা সরল, বাঁকা, বৃত্তাকার কিংবা যে কোনো ভাবেই হতে পারে। তাই অংকনের ক্ষেত্রে প্রতিটি রেখাই সমান গুরুত্ব বহন করে।

নানা ধরনের রেখার সমন্বয়ে কতগুলো অনুশীলন দেখানো হলো:-



রেখার সমন্বয়ে 'অনুশীলন'

এই সকল বিষয়সমূহ অংকনের সময় যে বিষয়গুলো আমাদের মনে রাখতে হবে, তা হলো বিষয়বস্তু বা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, তার সুখমতা দেবার অনুপাত এবং তার স্বার্থ স্বাপনা ইত্যাদি বিষয়ে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করতে হবে। এ সকল বিষয়সমূহ ঠিক রেখে আমরা যে কোনো বস্তু বা বিষয় অংকন করি না কেন, তার একটা সুন্দর প্রকাশ অবশ্যই ফুটে উঠবে।

প্রকৃতি থেকে অনুশীলন



আমাদের চারদিকে আমরা যা কিছু দেখছি তার সবই প্রকৃতি। এই প্রকৃতির আছে বর্ষিল রূপ। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রতি ফলন ফলন এর রূপ পাঠায়। সকালের নরম আলোয় প্রকৃতির যে রূপ, দুপুরের স্বর্ষর আলোয় তা পাল্টে যায়। আবার সূর্যাস্তে সে রূপ হয় ভিন্ন অনুভবের-আর এ সব কিছুই ঘটে আলো-ছায়ার আবর্তনে। আবার ঋতুর বৈচিত্র্যাত্মক ও এর পরিবর্তন ঘটে নানারূপে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্তে নানা রূপে প্রকৃতি সাজে অপরূপ সৌন্দর্যে।

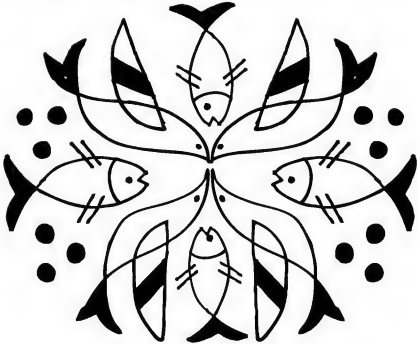
প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে আমরা সবাই ভালোবাসি। গ্রাম-বাংলার নানান দৃশ্য, নিপন্থ বিস্তৃত মাঠ। দূরের সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্ত, নদী-মাতৃক বাংলার অপরূপ সৌন্দর্য আমাদের প্রাণ ছুঁয়ে যায়। কখনোবা পরিপাটি শহরের রাজহাট, নীল আকাশ, নাগরিক সভ্যতা এই সবকিছু আমাদের মনে রেখাপাত করে। এইসব দৃশ্য জ্ঞানের পূর্বে তোমাকে গভীরভাবে বিষয়গুলোকে পরীক্ষণ করতে হবে। ধর, তুমি কোথায়ও বেড়াতে গেলে- সেখানে শুধু মাঠের পর মাঠ, অনেক দূরে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর, আরো অনেক দূরে নদীতে কয়েকটি পালতোলা নৌকা, আকাশে কয়েকটি পাখি উড়ে যাচ্ছে, সামনের দিকে কয়েকটি তালগাছ। ছবিটি তোমার মনের মাঝে ধারণ করে নিয়ে এসে যখন বাসায় একটা ছোট কাগজে আঁকতে বসবে, তখন পূর্বে যে ছবি আঁকার সাধারণ নিয়মগুলো জেনেছ, যেমন- আকার, আকৃতি, দূরত্ব অনুপাত, আলোছায়া ইত্যাদির সংযোগে এর সাথে তোমার মনের মাধুরী দিয়ে আঁকবে, ছবিটি তখন তোমার কাছে আরও বেশি জীবন্ত হয়ে উঠবে। তাই কোনো কিছু আঁকার পূর্বে তোমার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা যত বেশি বাড়বে ছবিও তত বেশি প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

এসব বিষয় খোঁজা রেখে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে প্রকৃতি থেকে বিভিন্ন বিষয়ের ছবি আঁকার অনুশীলন করবে।

নকশা

মাছ ও পাখি দিয়ে নকশা

৬ষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা নানা আকার যেমন ব্রিহুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত ইত্যাদি দিয়ে নকশা অংকনের কৌশল জেনেছি। আবার ফুল, সতা-পাতা দিয়েও নানা প্রকারের নকশা অংকনের অনুশীলন করেছি। এখন আমরা ও তুলোর সাথে আরও কিছু বিষয় যেমন পাখি, মাছের আকৃতি নিয়ে নিজেদের সৃজনশীল চিন্তা—এ দিয়ে আরও সুন্দর সুন্দর নকশা আঁকব। যে কোনো নকশা অংকনের পূর্বে, নকশায় যে সকল বিষয় ব্যবহার করব তার আকার ও আকৃতিগুলো আলাদা করে একে পরে তা একটি নির্দিষ্ট মাপের মাশ্বে সাজালে সুন্দর নকশা তৈরি হবে।



মাছ ও পাখির আকৃতি দিয়ে নকশা

নকশা হতে পারে বিভিন্ন কাজের প্রয়োজনে। যেমন—শাড়ির পাত, কামিজ বা পাঞ্জাবির গলার নকশা, টেবিল ক্লথ বা কুশনের জন্য, ফুলদানি, নকশি পাতিল বা অন্য যে কোনো জিনিসকে শিল্পরূপ দেয়ার জন্য নকশার প্রয়োজন হয়।

কাজ: মাছ ও পাখির আকৃতি ব্যবহার করে ৮" ৮" মাপে তোমার মনের মতো একটা নকশা একে দেখাও।

নমুনা প্রশ্ন

ব্যাবহারিক :

তোমার পছন্দমতো কোনো সংখ্যা দিয়ে মজার কোনো অনুশীলন করে দেখাও। ১.

আকার-আকৃতির ভিন্নতা দেখিয়ে যেকোনো তিনটি বস্তু অংকন করে দেখাও। ২.

তোমার গিয় স্বত্বর একটি চিত্র পোস্টার রং অথবা ছল রঙে আঁক। ৩.

২ই এবং ৪ই পেন্সিল ব্যবহার করে তোমার মনের মতো একটা পেন্সিল স্কেচ কর। ৪.

৮th ১০" পরিমাপে মাছ ও পাখির আকৃতি ব্যবহার করে একটা নকশা আঁক। ৫.

ষষ্ঠ অধ্যায় বিভিন্ন প্রকার শিল্পকর্ম



এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- জ তুলা দিয়ে বিভিন্ন প্রকার সৌখিন খেলা তৈরি করতে পারব।
- জ বিভিন্ন রঙের ক্লোন তৈরি করতে পারব।
- জ তুলা দিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য গুটি বা ব্যানার লিখতে পারব।

সৃষ্টিশীল

- জ সুই-সুতা দিয়ে কাপড়ের উপর বিভিন্ন ফোঁড় তুলতে পারব।
- জ বিভিন্ন ফোঁড়ের নাম জানব ও বিভিন্ন নকশা তৈরি করতে পারব।
- জ কাপড় ও তুলা দিয়ে বিভিন্ন রকম খেলা তৈরি করতে পারব।

কেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম

- জ ফেলনা জিনিস দিয়ে অনেক জিনিস তৈরি করতে পারব।
- জ এইসব জিনিস দিয়ে গিগেদের ঘর সাজাতে পারব।
- জ জিনিসের অপচয় করা থেকে বিরত থাকার চেতনা বাড়বে।
- জ আদু ও টেঁড়শ কেটে নকশা তৈরি করতে পারব।

পাঠ : ১

তুলা ও কাপড়ের তৈরি কারুশিল্প

তুলা দিয়ে সুন্দর একটি হাঁসের ছবি তৈরি করি। এছাড়া বিভিন্ন রঙের ফুল ও পাতা দিয়ে সাজানো ফুলদানির ছবি, পানি, বিড়াল এবং অন্যান্য জিনিস তৈরি করি। কভারসহ একটি কুশন তৈরি করি।

উপকরণ

তুলা দিয়ে কারুকর্ম করতে গেলে মূল উপকরণ হলো তুলা অথবা বুঝতেই পারছি। ব্যাভেজ করার তুলা, সাধারণ পেন্সা তুলা, বিভিন্ন রং, বিভিন্ন রঙের কাপড়, পিচবোর্ড, বোর্ড কাগজ, সাদা কাগজ, কার্বন কাগজ, ময়দার আঠা, আইকা আঠা, কাঁচি, সূঁচ, সুতা ইত্যাদি। তবে দুরকম তুলা রয়েছে। লেখা ও কুশনের জন্য, লেপ তৈরি করার পেন্সা বা ধুনা তুলা আর ছবির জন্য স্প্রায় স্প্রে সাজানো ব্যাভেজ করার তুলা। এছাড়া লগাবে-বিভিন্ন রঙের কাপড়, সাদা কাগজ, রঙিন কাগজ, পিচবোর্ড, পানিতে গোলানো রং, ময়দার ঘন আঠা, ধারালো কাঁচি, পেনসিল, কার্বন পেনপার, চক, বিভিন্ন রঙের কাপড়, মোটা সাদা কাগজ অথবা বাদামি কাগজ ইত্যাদি।

পাঠ : ২

তুলা দিয়ে লেখা

এবার তুলা দিয়ে লেখার কাজ আরম্ভ করি। প্রয়োজনীয় মাপের রঙিন কাপড় নেই। লাশ, নীল, সবুজ কিংবা বেগুনি যে রং আমাদের ভালো লাগে তাই। রং পাড় হতে হবে, হালকা রঙে ভালো দেখাবে না। পরিষ্কার পাকা মেঝে কিংবা টেবিলের উপর কাপড় বিছিয়ে যা লেখা হবে তা বড় বড় অক্ষরে চক দিয়ে লিখে নেই। পেন্সা তুলা দিয়ে ছোট ছোট বলের মতো গুটি তৈরি করি। হাতের তালুর উপর মাটি রেখে অল্য হাতের তালু দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হেমন করে গুটি বেগার আটার বগ তৈরি করা হয়, ঠিক তেমনি তুলায় গুটি তৈরি করা যায়। এবার কাপড়ের ওপর চকের লেখা বরাবর ময়দার ঘন আঠার সেই লাগিয়ে তুলায় গুটিগুলো চাপ দিয়ে একটি একটি করে বসিয়ে যাই। গুটি বসাবার সময় একটি অপরটির গা ঘেঁষে বসাতে হবে। আঠা লাগার কাপড়ের মধ্যে একটি আধুনির মতো গোল করে গুটির ঠিক নিচে।

গুটিগুলো সব সমান করে তৈরি করব। একই লেখায় ছোট-বড় গুটি ব্যবহার করলে লেখা ভালো দেখাবে না। গুটির ব্যাস ২ বা ৩ সেমি. পর্যন্ত হতে পারে। মোটা লেখার জন্য বড় গুটি আর সবু লেখার জন্য ছোট গুটি। ছবি দেবে আমরা সহজেই তুলা দিয়ে যেকোনো লেখা লিখতে পারব।



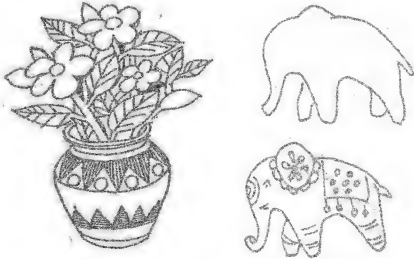
তুলা দিয়ে দেখা

পঠ : ৩

তুলা দিয়ে ছবি

যে ছবিটি তৈরি করব তাতে সাদা, লাল, হলুদ, কমলা, বেগুনি প্রভৃতি নানা রঙের ফুল থাকবে, আর থাকবে সবুজ পাতা ও ডাটা। থাকবে ফুলদানি, তাই নানা রঙের তুলার প্রয়োজন। পানিতে গোলানো যায় এ রকম পাউডার রং বাজারে পাওয়া যায়। যদি প্রয়োজনীয় সব ধরনের রং না পাওয়া যায় তাহলে এক রঙের সাথে অপর রং মিশিয়ে প্রয়োজনমতো রং তৈরি করে নিব। লাল ও হলুদ মিলিয়ে কমলা রং পাব, লাল ও নীল মিলিয়ে পাব বেগুনি রং। বাজারে যে সবুজ রং পাব তা গাছের পাতার সবুজ রং নয়। এই সবুজ রঙের সাথে সামান্য একটু লাল রং মিশিয়ে দিলে গাছের পাতার সবুজ রং হবে। ছবিতে যতগুলো রং ব্যবহার করব তার সব কয়টি রঙের তুলা আগেই রং করে অকিয়ে রাখব।

তুলা দিয়ে যে ছবিটি তৈরি করব, এবার পেনসিল দিয়ে কাগজে তার ছবি আঁকি। তুলার ছবি যত বড় করব কাগজের ছবি ঠিক তত বড় করে আঁকব। ছবিতে বিভিন্ন রঙের ফুল থাকবে, তাই ফুলগুলো হবে বিভিন্ন জাতের ও ছোট বড় বিভিন্ন আকারের। বিভিন্ন জাতের ফুলের পাতাও হবে বিভিন্ন আকার আকৃতির। এসব বিষয় মনে রেখে ছবিটি আঁকি। কার্বন কাগজের কালি বিছিয়ে তার ওপর পেনসিল দিয়ে আঁকা ছবিটি বসাই। ক্লিপ বা আলপিন দিয়ে কাগজগুলো একসাথে আটকিয়ে নেই, যাতে নাড়াচাড়া করলেও সরে না যায়। এবার ছবির ওপর দিয়ে প্রত্যেকটি রেখা ধরে পেনসিল চালিয়ে ছবিটি একে নিব। কার্বন কাগজের ওপর বিছানো কাগজে উল্টো হয়ে ছবির ছাপ পড়ে গেছে। এ রকম আরও দু-তিনটি উল্টো ছবির ছাপ নিব। পেনসিলে আঁকা ছবিটিতে রং দিয়ে ঠিক করে নেব তুলার তৈরি ছবিতে কোন ফুলের কী রং হবে? ফুলদানির রং কী হবে? পাতার রং কেমন হবে?



তুলা দিয়ে ছবি

আলাদা আলাদাভাবে কেটে রাখা এক এক ভাগ কাগজ নিই। ছবির ছাপের উট্টো পিঠে ময়দার আঠা লাগিয়ে নির্দিষ্ট রঙের তুলা প্রায় ১ সেমি. পুরু করে বসিয়ে চাপ দেই, যাতে ভালো করে সেঁটে যায়।

কাগজের সব কয়টি টুকরো এভাবে তুলা লাগিয়ে একটু শুকিয়ে নিই। ছবির চারপাশে বেশকিছু জায়গা থাকবে। এমনি মাপের এক টুকরো শক্ত পিচবোর্ড এবং পিচবোর্ডের চাইতে দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫ সেমি. করে বড় এক টুকরো কাগজ রঙের ভালো কাপড় নিই। কাপড় ভালো করে ইঙ্গি করা প্রয়োজন, যাতে কুঁচকানো না থাকে। কাপড়ের ওপর পিচবোর্ড বসিয়ে চার কিনারায় ভালো করে আঠা লাগিয়ে চারপাশের বাড়তি কাগজ ভাঁজ করে বোর্ডের সাথে সেঁটে দেই। খেয়াল রাখব বোর্ডের ওপর কাপড় যেন টান হয়ে থাকে, কোথায়ও যেন ঢিলা না হয়। এবার তুলা লাগানো কাগজগুলো কার্বন কাগজের ছাপ বরাবর ধারালো কাঁচ দিয়ে কেটে তুলার ফুল, পাতা, উঁটা, ফুলদানি ইত্যাদি তৈরি করব।

কাগজে আঁকা রঙিন ছবি দেখে তুলার ফুলদানি, ফুল, পাতা, ইত্যাদি পিচবোর্ড সাগানো কাগো কাপড়ের ওপর ছবির মতো সাজাই। ঠিকভাবে সাজানো হলে এক এক অংশ তুলা পেছনের কাগজে ভালো করে আঠা লাগাই এবং আবার ঠিক জায়গায় বসিয়ে চাপ দিয়ে কাপড়ের সাথে সেঁটে দেই। খেয়াল রাখব ছবির অংশগুলো চারদিকে যেন কাপড়ের সাথে ভালো করে লাগে, কোথায়ও যেন উঠে না থাকে। এবার দেখি, বিভিন্ন রঙের তুলা দিয়ে তৈরি ছবিটি বেশ সুন্দর লাগছে। ফুল ও পাতাগুলো আসল ফুল ও পাতার মতো নরম নরম মনে হচ্ছে। আমরা চেষ্টা করলে এই নিয়মে আমাদের খুশিমতো সুন্দর সুন্দর ছবি তৈরি করতে পারব। ফুলেরভেতর কেশর দিতে চাইলে পাপড়িগুলো আলাদা-আলাদাভাবে কেটে মাঝখানে অন্য রঙের তুলার কেশর বসিয়ে চারদিকে পাপড়িগুলো বসিয়ে দিতে হবে। শুধু ফুল-

পাতার ছবি নয়, এই নিয়ে বিভিন্ন রঙের জামা-কাপড় পরিয়ে মানুষের ছবি, পথ, পাখি, গাছপালা প্রভৃতির ছবি তৈরি করতে পারি। তুল্য দিয়ে করা ছবি কাঁচ দিয়ে ফ্রেম করে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখলে খুবই সুন্দর দেখাবে।

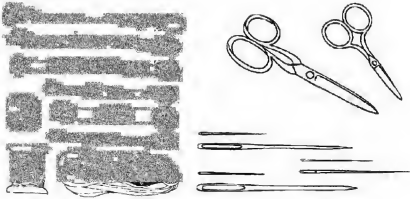
পাঠ : ৪

সৃষ্টিশিল্প

আমরা বাড়িতে মাকে সেলাই করতে দেখি। আমাদের জন্য জামা-কাপড়, জামার ওপর সুন্দর নকশা ইত্যাদি অনেক সৃষ্টিশিল্প তৈরি করেন। সুই, সুতার নানারকম কাজ আমরা নিজেরাও করি। ঘেমল-বোতাম লাগানো, ছোঁড়া কাপড় জোড়া দেয়া, ছোটখাটো দুমাল, টেবিলের কাপড় ইত্যাদি। গ্রামে ও শহরে অনেক বাড়িতেই আমরা কাঁথা ব্যবহার করি। কিছু আছে সাধারণ কাঁথা আবার কিছু আছে নকশিকাঁথা। কাঁথায় অনেক রঙের সুতা দিয়ে সেলাই ও নকশা থাকে। দেখতেও খুব চমৎকার। কাঁথায় পাখি, মাছ, ফুল, লতাগাছ, হাতি, ঘোড়া, মানুষ ইত্যাদি অনেক কিছুই রঙিন সুতায় সেলাই করে ছবি ও নকশা আকারে তুলে ধরা হয়। আবার অনেকে ছোট ছোট নকশিকাঁথা ছবির মতো বাঁধাই করে ঘরে সাজিয়ে রাখে। এই যে শিল্প, একে আমরা বলি সৃষ্টিশিল্প। এই শিল্প চারুশিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। বহুকাল ধরে নানি-দানিরা নানা রকম নকশা করা পাখা, তোয়ালে, জায়নামাজ, কাঁথা ইত্যাদি সেলাই করতেন। অবসর সময় তাঁরা অনেক দিন ধরে এক একটি কাঁথা তৈরি করতেন। সুই, সুতা দিয়ে নিজেদের সুখ-দুঃখের কাহিনী নকশা করে ফুটিয়ে তুলতেন। বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে সাধারণ পরিবারের মহিলারা এখনো নানা রকম নকশিকাঁথা তৈরি করছেন। এই নকশিকাঁথার পরিচিতি ও খ্যাতি লোকশিল্প হিসেবে পৃথিবীর সর্বত্র। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ও পৃথিবীর অন্যান্য সংগ্রহশালায় বাংলাদেশের এই লোকশিল্পের সজ্জাহ রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে এই শিল্পের বেশ প্রচলন হয়েছে। নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়েও বাজারে বিক্রি হচ্ছে। বাণিজ্যিকভাবে এর কদর বেড়েছে। এই ধরনের লোকশিল্প রপ্তানি করে আমাদের দেশে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। সৃষ্টিশিল্প সাধারণত গ্রামের মেয়েরাই বেশি করে থাকে। এই শিল্প আমাদের সৌন্দর্য বোধের মান উন্নয়ন করে প্রয়োজনও মেটাতে সাহায্য করে। সুই, সুতার কাজ করা দুমাল, টেবিলের কাপড়, শাড়ি, কামিজ, ওড়না, প্যান্ট, ছোট শিশুদের হুক, পর্দা ইত্যাদি দেখতে খুবই সুন্দর। আমরা নিজেরাও এ ধরনের জামা কাপড় পরতে খুব পছন্দ করি। তাই এই শিল্প শিখে নিজ নিজ প্রয়োজন মিটিয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারব। সেলাই ফেঁড়ের কাজের প্রধান বিষয় হলো নানা ধরনের ফাঁড় ও নানা রঙের সুতার যথাযথ ব্যবহার।

উপকরণ

সরু ও মোটা নানা ধরনের সুই। সাদা ও রঙিন সুতা বা উল। কাপড়ে দাল দেবার জন্য পেনসিল। প্রয়োজনমতো কাপড় অথবা চট। একটি ছোট কাঁচ। একটি ফ্রেম (সুই-সুতায় সেলাই করার জন্য)। উপকরণ রাখার জন্য একটি বাগ বা কেঁটা। কাপড়ে মাপ দেয়ার জন্য ফেল বা মাপ দেবার ফিতা। উপকরণ তৈরি হলো?



উপকরণ

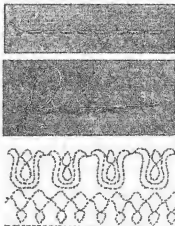
এবার কাপড়ে বা চটে সুই, সুতা দিয়ে সেলাই করে নকশা করতে হলে, আমাদের নাশা ধরনের ফোঁড় জানা দরকার। সুচিশিল্প বা এমব্রয়ডারি কাজে অনেক ধরনের ফোঁড় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এখানে কয়েকটি ফোঁড় ও এগুলো কীভাবে করতে হয়; ফোঁড়গুলোর চেহারা কেমন তা বুঝতে পারব ও ফোঁড়গুলো তুলতে পারব।

ফোঁড়গুলোর নাম

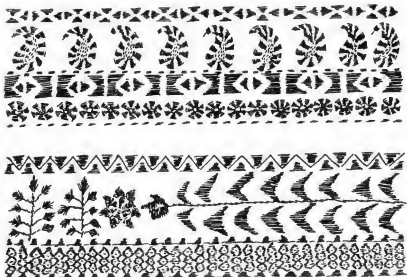
- ১। রানি ফোঁড় বা রান সেলাই
- ২। হেম ফোঁড় বা মূড়ি সেলাই
- ৩। বয়েয়া ফোঁড়
- ৪। স্টেম ফোঁড়
- ৫। ডেইন ফোঁড়
- ৬। গেজি-ডেইজি ফোঁড়
- ৭। ক্রস ফোঁড়
- ৮। তারা ফোঁড়
- ৯। বোতাম ঘর ফোঁড়
- ১০। কমলা ফোঁড়
- ১১। সার্ভিন ফোঁড়
- ১২। হেরিংবোন ফোঁড়।

রানিং ফোঁড় বা রান সেলাই

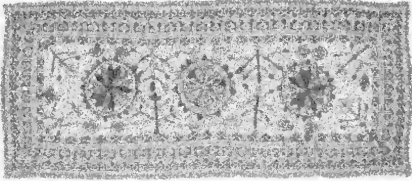
বিভিন্ন ফোঁড়ের মধ্যে রানিং ফোঁড় বা রান সেলাই সবচেয়ে সহজ। যে কাপড়ের ওপরে সেলাই করব সেটিকে বা হাত দিয়ে একটু উঁচু করে ধরে ডান হাতে সুঁই নিয়ে সেলাই করব। কাপড় বা হাতের ওপরে রেখে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে অবশিষ্ট চারটি আঙ্গুলের উপর কাপড়খানাকে চেপে ধরি, ডান হাতে সুঁই ধরে, একবারে ৩ থেকে ৪টি ফোঁড় করা যাবে। তবে প্রতিবারই ৩-৪টি ফোঁড় দেবার পর, সুতা টেনে সেলাইটি শক্ত করে নেব। রানিং ফোঁড় শেখার জন্য সাদা কাপড় হলে রঙিন সুতা, রঙিন কাপড় হলে সাদা সুতা ব্যবহার করব। কারণ এতে সেলাই সোজা ও সমান হচ্ছে কিনা তা সহজেই বুঝতে পারব। এই ফোঁড় দিয়ে যেমন রেখা সেলাই করা যায়, তেমনি ভরাটি সেলাইও করা যায়। নকশিকাঁথায় রানিং ফোঁড় বহুলভাবে ব্যবহার করা হয়।



রান ফোঁড় ও নকশা



রান ফোঁড়, রান ফোঁড়ের ভরাটি ও রান ফোঁড়ের নকশা



রান ফোঁড় দিয়ে নকশাকার জায়নামাজ

হেম ফোঁড় বা মুড়ি সেলাই

টেবিলের কাপড়, রুমাল, জামা ইত্যাদি কাপড়ে তৈরি যে কোনোটির কিনারা মুড়ে সেলাই করার জন্য এই ফোঁড় ব্যবহার করা হয়। টেবিলের কাপড়, রুমাল, জামা ইত্যাদি কাপড়ে তৈরি যে কোনোটির কিনারা মুড়ি সেলাই করার জন্য যে ফোঁড় ব্যবহার করা হয় তাকে হেম ফোঁড় বা মুড়ি সেলাই বলে। এই সেলাই করার সময় কাপড়ের কিনারা এমনভাবে ভাঁজ করে নেব, যাতে কিনারার সুতাগুলো বেরিয়ে না পড়ে। এই ফোঁড় দিয়ে কুশন, জামা, শাড়ি, টেবিলের কাপড় ইত্যাদিতে এ্যাপ্লিক নিয়মে নকশা করা যায়। এ্যাপ্লিক হলো রঙিন কাপড় কেটে অন্য কাপড়ের ওপর বসিয়ে নকশা করা। হেম বা মুড়ি সেলাই শিখে নিলে আমরা এ্যাপ্লিক পদ্ধতিতে নানা রকম কাজ করতে পারব।



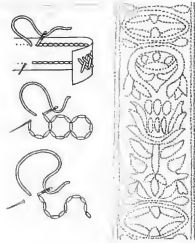
হেম ফোঁড় বা মুড়ি সেলাই



হেম ফোঁড় দিয়ে এ্যাপ্লিক কাজ

বখেয়া ফৌড়

বখেয়া ফৌড় সোজা দিকে মেশিনের সেলাই-এর মতো দেখতে হয়। এই ফৌড় তুলতে হলে, রানিং ফৌড়ের মতো নিচ থেকে ওপরে সুই চালিয়ে ফৌড় তুলতে হয়। পরে সামান্য একটু সামনে আবার ওপরে সুই দিয়ে ফৌড় তুলে আনি। সুই এর মুখটি আবার আগের ফৌড়ের কাছে ফিরিয়ে আনি। পুনরায় ওপর থেকে নিচে ফৌড় তুলি। এভাবে বার বার ফৌড় দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাই। দেখব মেশিনের সেলাইয়ের মতো সেলাই হয়েছে। এই ফৌড় সাধারণত জামা-কাপড়ের জোড়া লম্বাতে প্রয়োজন হয়। বখেয়া ফৌড়ের জোড়া খুব শক্ত হয়। তাছাড়া এই ফৌড় দিয়ে নানা রকম নকশাও করা যায়। যেমন-২৫ সেমি. চওড়া ও ২৫ সেমি. লম্বা কাপড়ে প্রথমে পেছনে একটি মাছের ছবি একে রেখা অনুযায়ী বখেয়া ফৌড় তুলে মাছের ছবিটি ফুটিয়ে তুলতে পারি। অন্যদ্য যেকোনো নকশাও বখেয়া ফৌড় দিয়ে করতে পারব।



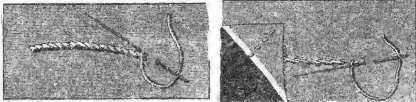
বখেয়া ফৌড় ও বখেয়া ফৌড়ের নকশা

পঠ: ৬

স্টেম ফৌড় বা ডাল ফৌড়

ডাল ফৌড় সাধারণত ঘাছের ডাল, ফুল ও পাতার ডাল, লতা ইত্যাদি নকশা সেলাই করবার জন্যে ব্যবহার করা হয়। এই ফৌড় দিয়ে রেখার আকারে সেলাই করে গেলে, রেখাটি দড়ির মতো প্যাঁচানো প্যাঁচানো দেখা যায়।

ডাল ফৌড় দিয়ে সেলাই করবার সময় ফৌড়গুলো পর পর সামনে থেকে পেছনের দিকে আসবে। সুঁচ সুতা পরিয়ে সুতার মাথায় গিট দেই। সুঁচের মাথা কাপড়ের নিচ দিক দিয়ে ওপরে তুলি। সুঁচের মাথা যেখানে উঠল তার থেকে সামান্য পেছনে বা দিকে একটু সরিয়ে, সুই ছকিয়ে, ফৌড় দুটির মাঝামাঝি জায়গায়, ডাল



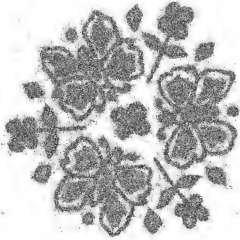
স্টেম ফৌড় বা ডাল ফৌড়

দিকে একটু সরিয়ে সূঁচের মাথা উঠাই। এবার সূঁচের মাথা যেখানে উঠল তার পেছনে বা দিকে একটু সরিয়ে আবার সূঁচের মাথা ঢোকাই এবং শেষ দুই ফোঁড়ের মাঝামাঝি জায়গায় একটু ডানে সরিয়ে সূঁচের মাথা গুঁঠাই। এভাবে একের পর এক ফোঁড় দিয়ে সামনে থেকে পেছনের দিকে আসতে থাকি। দেখি সেলাই কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে!

পাঠ: ৭

চেইন ফোঁড়

এই ফোঁড় দেখতে অনেকটা শেকলের মতো। চেইন ফোঁড়ের জন্যে অপেক্ষাকৃত একটু মোটা সূতা নিই। সূতার শেষ মাথায় শক্ত করে গিট



নকশাটি ডাল ফোঁড় দিয়ে করি

দেই। অথবা শক্ত করে একটি ফোঁড় তুলি।

সুই, সূতা টেনে ওপরে তুলি। এবার সূঁচের মাথায় ডান হাত বাঁয়ে সূতা ঘুরিয়ে একটি ফোঁড় তুলি। দেখব ফোঁড়টি একটি বেড়ির মতো হয়েছে (হাত ঘুরাবার সময় সূতা কিছুটা ঢিলে রাখবে)। সূঁচটিকে এবার আগের ফোঁড়ের পাশ দিয়ে ঢুকিয়ে নিচ থেকে ওপরে তুলি। ফোঁড় তোলার সময় সূঁচ, সূতার ওপর সবসময় রাখতে হবে। সূতা আবার ডান থেকে বাঁয়ে ঘুরিয়ে ফোঁড় তুলি। এভাবে ফোঁড়ের পাশ দিয়ে সুই ঢুকিয়ে নিচ থেকে ওপরে সূতা আনি।

চেইন ফোঁড় দিয়ে যেকোনো পোশাকে নকশা করা যায়। বিশেষ করে জামা, শাড়ি, রুমাল, টেবিলের কাপড় ইত্যাদিতে ফুল, লতাপাতা করা যায়। ভরাট কাজেও এই ফোঁড় ব্যবহার করতে পারব। চিত্রকলায় বৈচিত্র্য আনতে এই সেলাই ব্যবহার করতে পারব।



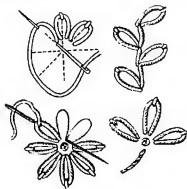
চেইন ফোঁড়



সেলি-ডেইজি ফোঁড়

সেলি-ডেইজি ফোঁড় চেইন ফোঁড়ের মতই করতে হয়। তবে চেইন সেলাইয়ে ফোঁড়গুলো লাইন ধরে সামনে এগিয়ে যায় এবং এ ফোঁড়গুলোর আলাদা আলাদা এক-একটি চেইন ফোঁড় থাকে। রুমাল, ছোটদের জামা-কাপড় বা যেকোনো পোশাক পরচ্ছিদ খোকা খোকা ফুল, নকশা, লতা, পাতা ইত্যাদি এই ফোঁড় দিয়ে করলে চমৎকার দেখায়।

এবার দুমালে ফুল লতা-পাতার নকশা একে তাত্তে লেজি-ডেইজি ফোঁড় তুলে নকশাটি ফুটিয়ে তুলি। বিভিন্ন রকমের ফোঁড় শেখা হলো। এবার একটি দুমাল ও টেবিলের কাপড় তৈরি করার চেষ্টা করি। দুমাল গুথ্যকেরই গুয়োজন। আমরা ফুলে বা অন্য কোথাও বের হবার সময় সাথে একটি দুমাল রাখি। তাহলে গুথমেই একটি দুমাল তৈরি করা শিখি। দুমাল সেলাই শিখে নিজের ব্যবহার করতে পারব। অন্যদেরও উপহার দিতে পারব।



লেজি-ডেইজি ফোঁড়

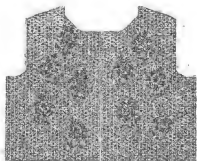


লেজি-ডেইজি ফোঁড়ের নকশা

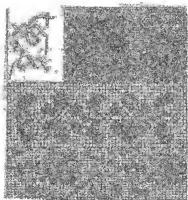
পাঠ : ৮

ক্রস ফোঁড়

এই ফোঁড় অনেকটা ক্রস বা গুণ চিহ্নের মতো। ক্রস ফোঁড়ের জন্য সাধারণত নেট কিংবা সেলুলা কাপড় ব্যবহার করা হয়। সেলুলা কাপড়ের গুঁমি ঘর ঘর করা ছকের মতো। চটের ওপরও এই ফোঁড় সুন্দরভাবে করা হয়।



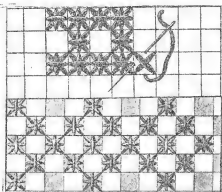
ক্রস ফোর্ড দিয়ে জ্যাকার্টের নকশা



হাফ বা ছক কাগজে আঁকা নকশাটি ঘর গুলে গুলে করি

তারা ফোর্ড

তারা ফোর্ড হলো অনেকটা ক্রস ফোর্ডের মতো। ছবি দেখে অন্যায়সে এই ফোর্ড তুলতে পারব। এই ফোর্ড সাধারণত চেক কাপড় বা চটে করা সহজ।



তারা ফোর্ড

পাঠ : ৯

বোতাম ঘর ফোর্ড

জামা কাপড়ে বোতাম ঘর কাটার পর কাটা অংশ থেকে যাতে সুতা বেরিয়ে না আসতে পারে সেজন্য সেলাই করে বোতাম-ঘরের দু'খ বেঁধে দেয়া হয়। বিশেষ ধরনের যে ফোর্ড দিয়ে এই সেলাই করা হয় তাকে বলে বোতাম ফোর্ড। (ছবি দেখে করি)



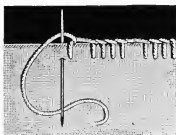
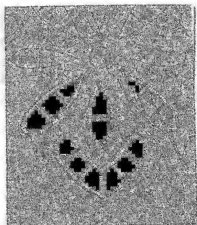
বোতাম ঘর ফোঁড়

বোতাম ঘর ফোঁড়
দিয়ে কাটগুয়ার্ড

পার্শ্ব: ১০

কমল ফোঁড়

পায়ের শাল, কমল ইত্যাদির প্রাঙ্গণ সেলাই করার জন্য এই ফোঁড় ব্যবহার করা হয়। কমল ফোঁড় খুবই সহজ। অনেকটা বোতাম ঘর ফোঁড়ের মতো।



কমল ফোঁড়

সার্টিং ফৌড়

সার্টিং ফৌড়ও বেশ সহজ। ছবি দেখেই আশা করি আমরা করতে পারব। এই ফৌড় পাশাপাশি তুলতে হয়।



সার্টিং ফৌড় দিয়ে মুগ পাতা

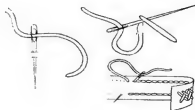


সার্টিং ফৌড় দিয়ে
নকশা

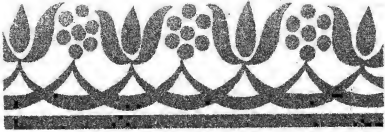


হেরিৎ বোল ফৌড়

এই ফৌড় অনেকটা ক্রস ফৌড়ের মতো। ক্রস ফৌড় যেভাবে করতে হয়, এই ফৌড়ও অনেকটা সেভাবেই করব। ছবি দেখে আশা করি সহজেই ফৌড়টি আমরা বুঝতে পারব।



হেরিৎ ফৌড় ও নকশা



নকশাটি হেরিংবোন ফোঁড় দিয়ে অনুশীলন করি

ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম

কোনো কাজে লাগবে না তেবে জিনিস আমরা ফেলে দেই, সেগুলোকেই বলি ফেলনা জিনিস। একটু চিন্তা করে নিজের কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে এসব ফেলনা জিনিস দিয়েও আমরা অনেক সুন্দর-সুন্দর শিল্পকর্ম তৈরি করতে পারি। প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায় এমন অনেক জিনিসই আমাদের আশেপাশে ছড়িয়ে আছে যা সাধারণভাবে আমাদের চোখে ফেলনা। আমরা খুব একটা খেয়াল করি না, তেমন নজরে পড়ে না এমন সব জিনিস দিয়েও অনেক সুন্দর-সুন্দর জিনিস তৈরি করা যায়। সুন্দর কিছু তৈরি করার প্রবল ইচ্ছা ও কল্পনা শক্তি এ দুটিকে কাজে লাগালেই আমরা গাছের শুকানো ডালপালা, পাটকাঠি, কাঠের টুকরা ইত্যাদি ফেলনা জিনিসকে রূপে-রসে ভরে দিয়ে গ্রন্থবন্দ্য ও আকর্ষণীয় শিল্পকর্মে রূপায়িত করতে পারি। এমনি দু-একটি শিল্পকর্মের কথা জেনে নেই।

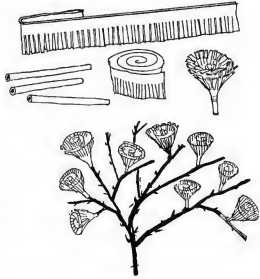
কোনো ভালে কাগজের ফুল

বরই গাছের ছোট একটা কাঁটাওয়ালা ডাল নাও। অন্য কোনো গাছের ডাল নিলেও চলবে, তবে তাতে কাঁটা থাকতে হবে। সালা কিংবা হালকা হলুদ রঙের খুঁড়ির কাগজ নিয়ে ২.৫০ সিমি, ৮ ওড়া লম্বা ফালি কর। কাগজের ফালি তিন চার ভাঁজ করে ২.৫৪ সেমি, ৮ ওড়া ও ১৫ সেমি, লম্বা কর। এবার কাঁচি দিয়ে কাগজের ফালির একপাশ চিকন-চিকন করে কাঁচি, অপর পাশে মোটামুটিভাবে ৬ সেমি, মতো জায়গা আগাগোড়া জোড়ানো থাকবে, যেন কাটা না হয়। এভাবে কাটা কাগজের ফালিটি কিছুটা চিরুনির মতো মনে হবে। কাগজের ফালি কাটা হয়ে গেলে ভাঁজ খুলে নিই। পাটকাঠির মাথার সব অংশ বেছে কয়েক টুকরো পাটকাঠি নিই। ধারালো ছুরি বা পুরনো ব্রেড দিয়ে এক টুকরো পাটকাঠির এক মাথা সমান করে কাঁচি। এবার চিরুনির মতো কাটা কাগজের ফালির জোড়ানো পাশে ময়দার আঠা লাগিয়ে পাটকাঠি সমান করে কাটা মাথার ৬৩৫ সেমি, পরিমাণ জায়গায় কাগজের জোড়ানো অংশের মাথা বসিয়ে

পাঁচিয়ে যাই। এক প্যাচের ওপর অন্য প্যাচ পড়বে। এভাবে পাঁচ-ছয় প্যাচ দেওয়ার পর কাগজের ফালি ছিঁড়ে আলাদা করে নিই। এবার ধারালো ছুরি বা ড্রেড দিয়ে কাগজের প্যাচ খেঁষে কাগজ সমেত পটিকাঠির মাথাটি কেটে নিই। এবার পটিকাঠির টুকরোয় প্যাচানো কাটা কাগজের সবু মাথাগুলো চারদিকে সমান করে ছড়িয়ে দিই। কী সুন্দর ফুল হয়ে গেল।

এভাবে একই পটিকাঠির মাথায় বার বার চিরুনির মতো কাটা কাগজ পেঁচিয়ে কেটে নিয়ে একটির পর একটি ফুল তৈরি করতে পারি। এক টুকরো পটিকাঠি শেষ হয়ে গেলে আরেক টুকরো নেব। প্রয়োজনীয় পরিমাণে ফুল তৈরি হয়ে গেলে শুকনো ডালের এক একটি কাটায় এক একটি ফুল গাঁথে বসিয়ে দেই। ডালের কাটার চেয়ে ফুলের নিচের পটিকাঠির টুকরো অনেক নরম, তাই গাঁথতে কষ্ট হবে না। সমস্যা ডাগটি ফুলে ফুলে ভরে দিই। কত

সুন্দর লাগছে। হোট একটা ফুলের টবে মাটির মধ্যে ফুলের ডালটি পুঁতে একটা মানানসই জায়গায় রাখি। দূর থেকে দেখি সবাই যখন আসল ফুল বলে ভুল করবে তখন আমাদের কেমন আনন্দ হবে।

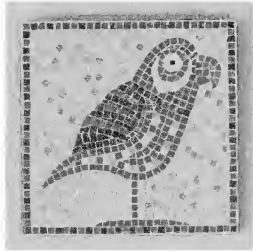


মোজাইক ছবি

৮-১১ ইন্ড্রি কাপড় ও অহিকা আঠা নিই। কাপড়ের ওপর একটি পাখি আঁকি। এরপর বিভিন্ন রঙের কাগজ লাগিয়ে কাপড়ের ফুলের ওপর একটার পর একটা ঠিকভাবে সাবধানে লাগাই। পাখির বাহিরে অন্য রঙের টুকরো লাগাতে হবে। দুদিন এভাবে রেখে নিই। পরে ফ্রেম করে ঘরে টানাতে পারব। এটি তৈরি করতে খুব আনন্দ পাব।

এভাবে ইচ্ছে করলে রঙিন কাগজ দিয়েও একইভাবে যেকোনো ফুল, হাতি বা যেকোনো মোজাইক ছবি তৈরি করতে পারব।

মোজাইক ছবি

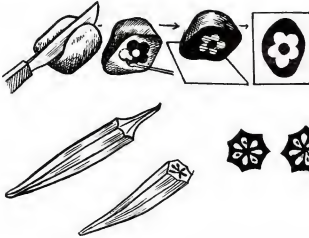


আলু ও টেঁড়স কেটে রঙে ছবিতে ছাপচি

আলু, টেঁড়স অথবা করলা কেটে যেকোনো রং দিয়ে ছাপ দেওয়া যায় (বৃন্তের নমুনা অনুসারে)। আলু, টেঁড়স ও করলা অথবা ছাপ দেওয়া যায় এ ধরনের যেকোনো তরকারি কেটে এবং সেটি দিয়ে কাগজে রঙের ছাপ দিয়ে সুন্দর নকশা তৈরি করা যায়। এছাড়াও বিভিন্ন নতুন ধরনের জিনিস দিয়ে ছাপ দিলে সুন্দর-সুন্দর প্যাটার্ন তৈরি করা যায়।

ধরোজনীর তথ্য

পানি দিয়ে গুলানো যে কোনো রং এক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। এই ছবিতে আলু জাতীয় কোনো নরম বস্তু প্রথমে মসৃণ করে টুকরো কেটে নিয়ে তারই একাংশ গর্ত করে খুঁদে নিয়ে কীভাবে ছাপানোর উপযোগী সাময়িক বস্তু করে নিতে হবে তা দেখানো হয়েছে। ঐ খোদাইকৃত অংশে রং লাগিয়ে তা দিয়ে নির্দিষ্ট কাগজে বা কাপড়ে ছাপ মারলেই চমৎকার নকশার সৃষ্টি হবে।

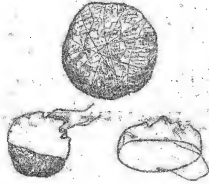


ফেলনা কাগজের মুখোশ তৈরি

ফেলে দেয়া অনেকগুলো কাগজ জোঁগাড়া করি। কাগজগুলো ১ দিন পানিতে ভিজিয়ে রাখি। আটার লেই তৈরি করি (জ্বাল দিয়ে)। এবার কাগজ পানি থেকে চিপড়িয়ে তুলে নিই। আটার লেইয়ের সাথে কাগজের জিনিসগুলো মিশিয়ে নিই।

এতে মক তৈরি হবে। মকের সাথে একটু তুঁত মিশিয়ে নিতে হবে। তা না হলে পোকায় কেটে ফেলবে।

অনেকগুলো শুকনো কাগজ, দড়ি বা সুতলি দিয়ে গোল করে মাঝারি বলের আকার তৈরি করি। এবার বলের উপরের দিকে মাটির মতো কাগজের মন্ড দিয়ে যেকোনো বিড়াল বা মানুষের মুখের আকৃতি করি। দুই-তিন দিন শুকতে দিই। শুকিয়ে গেলে নিচ থেকে কাগজের বলটি বের করে ফেলি। মানুষ বা বিড়ালের মুখোশ তৈরি হয়ে গেল। এবার রং করি। (ছবি দেখে করতে পারব)



ফেলনা কাগজের মন্ডের মুখোশ তৈরি



মটি দিয়ে যেকোবে কাজ করা যায় তেমনি মন্ড দিয়েও খেলনা ও পুতুল তৈরি করা যায়

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সূঁচিশিঙ বগতে বোঝায়-

- (ক) পোশাক (খ) কয়েকটি ফোঁড়
পরিচ্ছদ (গ) চিত্রকর্ম (ঘ) এক ধরনের কারুশিল্প।

২. চেইন ফোঁড় দিয়ে করা যায়-

- (ক) রেবা সেলাই (খ) রেবা ও ড্যাট
(গ) শুধু মোটা রেবা কাজ (ঘ) মুড়ি

৩. বোতাম ঘর ফোঁড় ব্যবহার করা হয়- সেলাই।

- (ক) শুধু বোতাম ঘর সেলাইয়ের জন্য (খ) বোতাম ঘর ও অন্যান্য ফুল লতা ইত্যাদি সেলাইয়ের
জন্য (গ) শুধু লতা-পাতা সেলাই করার জন্য।

৪. তুলা দিয়ে ছবি করতে হলে প্রথমে-

- (ক) ছবির কাপড়ের ওপর পেনসিল দিয়ে ছবি আঁকতে (খ) তুলা কেটে কেটে বলিয়ে দিতে হয়
হয় (গ) তুলার ওপর ছবি একে কাটতে হয় (ঘ) কাগজের ওপর আগে ছবি একে
নিতে হয়।

৫. ছবি তৈরির জন্য উপযোগী তুলা-

- (ক) সাধারণ পেঁজা (খ) শিমুল তুলা
তুলা (গ) ব্যাডেজের (ঘ) কার্পাস তুলা

৬. তুলা দিয়ে রঙিন ছবি তৈরি করতে হলে-

- (ক) ছবি তৈরি করার পর রং লাগানো হয় (খ) এক এক অংশে কেটে কেটে রঙে চুবাতে হয়
(গ) আগেই তুলা রং করে ডকিয়ে রাখতে হয়

শিখে জবাব দাও

১. সূঁচিশিঙ সম্পর্কে একটি সাধারণ আলোচনা কর।
২. সুঁই-সুতার কাজে কী কী উপকরণের প্রয়োজন?
৩. তোমার জানা কয়েকটি ফোঁড়ের নাম লেখ।

ব্যবহারিক (অশরায়)

১. একটি নুমালা তৈরি করে তাতে ডাল ফোঁড়, শ্বেজি-ডেইজি ফোঁড় ও বোতাম ঘর ফোঁড় দিয়ে একটি নকশা সেলাই কর।

উদ্দেশ্যকট পড় ও প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও-

রীনা ও আপন একদিন ওদের বন্ধু কাজলের বাড়িতে বেড়াতে গেল। বাড়িতে ওরা দেখল ওর মা অনেক মহিলাকে বিভিন্ন সেগাই শেখাচ্ছেন। কেউ কেউ আবার দলপাতভাবে একটি নকশিকাঁথা সেগাই করছেন। নকশিকাঁথায় মাছ, মানুষ, হাতি, ঘোড়া, পাখি, নৌকা ইত্যাদি আঁকা। এগুলো দেখে ওদের নতুন অভিজ্ঞতা হলো। ওরা ঠিক করল বাড়িতে এসে ওরাও এভাবে ছোট একটি নকশিকাঁথার সেগাই দিয়ে ছবি তৈরি করবে। এবং নিজেদের ঘর সাজাবে।

ক) রীনা ও আপন কোথায় বেড়াতে গেল?

খ) কাজলের মা কী কী শেখাচ্ছিলেন?

গ) নকশিকাঁথায় কী কী জিনিসের ছবি আঁকা ছিল?

ঘ) রীনা ও আপন কী তৈরি করবে?

ঙ) ওরা ছবিটি কী করবে?

ৰং ও ৰঙেৰ ব্যৱহাৰ

প্রাথমিক ৰং



হালধী



লাল

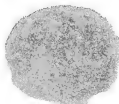


নীল

মাধ্যমিক ৰং



কমলা



সবুজ



বেগুনি

প্যাণ্টেল ৰং



হালধী



লাল



নীল



কমলা



সবুজ



বেগুনি



ନିମ୍ନ ଶାଖାରେ ଥିବା ଘର ଶାଖା ନିମ୍ନ ଥିବ



୧୯୩୯ ମସିହାରେ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ଗୁମାସ୍ତା ଗୃହ, ଗୁମାସ୍ତା ଗୃହ, ଗୁମାସ୍ତା ଗୃହ



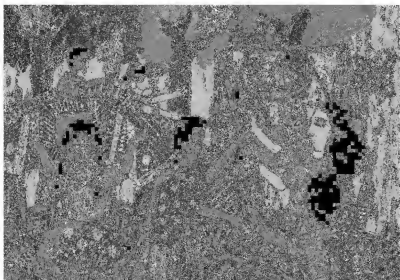
ভালিয়া আমল ফুলফলের পোশাকের রঙে খাঁকা গ্রামীণ জীবন



মোঃ শাহনেওয়াজের দল রঙে খাঁকা গ্রামীণ জীবন

চাষ ও কারুকলা

৬৬



শেস্তার মধ্যে ছবিটি আঁকা



শেস্তার মধ্যে ছবিটি এঁকেছে আম্মেল জুবারের আব্দু

৩৬

বিভিন্ন প্রকার শিল্পকর্ম



উপরের ছবি দুটি শামিরা আমান জবির মূল রঙে আঁকা



୧୯୩୭ ମସିହାରେ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ଗୁମାସ୍ତା ଗୃହ, ଗୁମାସ୍ତା ଗୃହ, ଗୁମାସ୍ତା ଗୃହ

১৮

বিভিন্ন প্রকার শিল্পকর্ম



বিভিন্ন প্রকারের কাকার ছিঁড়ে কোলাজ ডিউ



ছবিটি ভাল রঙে এঁকেছে কলসিকা আহমেদ দুই



সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর
— মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরামর্শ মানসিক শক্তি বাড়ায়



২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

স্থানে :

